অধিকার চর্চায় গণগবেষণা
ও
তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

সুশাসন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গণগবেষণা ও
তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা

অধিকার চর্চায় গণগবেষণা
ও
তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

অধিকার চর্চায় গণগবেষণা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকাশক
নেটজ বাংলাদেশ
পল্লীশ্রী
মানবকল্যাণ পরিষদ (এমকেপি)
রির্সাচ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)

যোগাযোগ
রির্সাচ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি নং ৫৪ (৩এ), সড়ক নং ১১, ব্লক ফ
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন : +৮৮০-২-৫৫০৪২৩৪৫-৬
ই-মেইল : rib@citech-bd.com
Website : www.rib-bangladesh.org

মুদ্রণে :
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৮৮২৮৭০৩, ৮৮৩৫৮৩৬

মূল্য ঃ দুইশত টাকা

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান কমিশন-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দায়ভার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশকের এবং এটি কোনো অবস্থাতেই ইউরোপিয়ান কমিশন-এর মতামতের প্রতিফলন হিসেবে গৃহীত হবে না।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৫

পাটিসিপেটরী একশন রিসার্চ (গণগবেষণা) ঃ জীবনের পাঠশালা থেখে শিক্ষা ৭

১. ভূমিকা ৯
২. আত্ম-নির্ভরতা এবং সামগ্রিক (holistic) সচেতনতা অভিমুখে ১০
৩. উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে আরও কিছু কথা ১১
৪. গণনিয়ন্ত্রিত ত্রাণ বিতরণের ওপর "কর্ম গবেষণা" ১২
৫. জীবনের পাঠশালায় 'প্রাথমিক' থেকে 'মাধ্যমিক' স্কুল ১৪
   - লক্ষ্মী না সরস্বতী ? ১৪
   - 'লোক চেতনা জাগরণ' ১৫
   - স্বনির্ভরতার অর্থ ১৬
   - 'প্রতিশক্তি' হিসেবে গণশক্তি ১৭
৬. ভূমিসেনার সাথে সহ-গবেষণা ১৭
   - "তোমাদের বন্ধু হবার দরখাস্ত আমরা গ্রহণ করলাম" ১৮
৭. উজ্জীবকদের সংবেদনশীল করবার (sensitization) প্রক্রিয়া- শ্রীলংকা ১৮
   - "তিনি আমাদের মগজ থেকে মরচেটা সরিয়ে দিয়েছেন" ২০
৮. মূলবোধ উজ্জীবিত করা - ফিলিপাইনের "সারিলাকাস" ২১
৯. আরও কিছু গণগবেষণা (PAR) ২৩
১০. PAR এর বৈধতাকরণ ২৭
১১. "মাফ করবেন স্যার, কিন্তু আপনি একটি লেকচার দিয়ে ফেলেছেন" ২৮
১২. "আমরা দরিদ্র নই একথা বলার জন্য ধন্যবাদ" ২৯
১৩. "পরস্পরকে নির্মাণ ও শাণিত করা" ৩১
১৪. উপসংহার ৩২

তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ ৩৭

প্রথম অধ্যায় : তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ ৩৯
১. ভূমিকা ৩৯

২. তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন ? ৩৯
৩. সরকার কি ধরনের তথ্য জনগণের কাছ থেকে সাধারণতঃ গোপন রাখতে চায় এবং কেন ? ৪০
৪. 'তথ্য' বলতে কী বোঝায় ? ৪০
৫. তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য কী ? ৪১
৬. কোন্ অফিস থেকে তথ্য পাওয়া যাবে ? 'কর্তৃপক্ষ' বলতে কী বোঝায় ? ৪২
৭. কার কাছে তথ্য পাবার জন্য আবেদন করতে হবে ? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাকে বলে? ৪২
৮. জনগণ কোন্ ধরনের তথ্য কীভাবে পেতে পারে ? ৪৩
৯. কোন্ ধরনের তথ্য এই আইনের আওতায় পড়বে না ? ৪৪
১০. অন্য কোন আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে কী হবে? ৪৫
১১. তথ্য সংরক্ষণ ৪৫
১২. তথ্য প্রকাশ, স্বেচ্ছা প্রকাশ ও বার্ষিক রিপোর্ট ৪৫
১৩. তথ্য পেতে হলে একজন নাগরিককে কী করতে হবে? এককভাবে না অনেকে মিলে আবেদন করা যাবে ? ৪৬
১৪. তথ্য পাবার জন্যে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে কী? ৪৬
১৫. আবেদনপত্র পাবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কী করতে হবে ? ৪৭
১৬. অনুরোধকৃত তথ্য না পেলে কার কাছে আপীল করতে হবে এবং আপীল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী? ৪৮
১৭. আপীলের রায় না পেলে বা তা সন্তোষজনক না হলে কার কাছে অভিযোগ করতে হবে? ৪৮
১৮. তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী? ৪৯
১৯. তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাবে কী ? ৫০
২০. উপসংহার ৫০
দ্বিতীয় অধ্যায় : সরকারের কাছ থেকে কি ধরনের তথ্য পেলে সাধারণ মানুষের উপকার হবে? ৫১
তৃতীয় অধ্যায় : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদন ও অভিযোগপত্রের নমুনা ৫৪
চতুর্থ অধ্যায় : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইনের সুফলের কিছু উদাহরণ ৬০
পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র ও দুর্নীতি দূরীকরণে কিছু সফলতার দৃষ্টান্ত ৬৮
সংযোজনী - এক : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ৮৮

মুখবন্ধ

স্থানীয় পর্যায়ে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনসমূহকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সুশাসন ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে নেটজ বাংলাদেশ, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব), পল্লীশ্রী ও মানব কল্যাণ পরিষদ (এমকেপি) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী জেলায় Civil Society Organisations Strengthen Democratic Governance শিরোণামে ২০১৬ সাল থেকে একটি প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জনগণ, সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সহজলভ্য করার পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই "অধিকার চর্চায় গণগবেষণা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ" বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে। যেহেতু ইতোমধ্যে রিইব এর দু'টো প্রকাশনা 'পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ (গণগবেষণা) জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা' ও 'তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ' - এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে এক, তাই আমরা উক্ত প্রকাশনাদু'টিকে একত্রিত করে **"অধিকার চর্চায় গণগবেষণা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ"** বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব মোঃ আনিসুর রহমান এবং রিইব - এর প্রতি, যারা অনুমতি প্রদান করায় আমরা তাদের প্রকাশিত বই এখানে অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছি। 'জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা' বইটি মোঃ আনিসুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা যেখানে তিনি খুব সহজবোধ্য ভাষায় 'গণগবেষণা' কি এবং জনগণ কিভাবে গণগবেষণা চর্চার মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে উন্নয়নমূখী জীবনযাত্রায় অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রকাশনার 'তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ' অংশটিতে জনগণ যাতে সঠিকভাবে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' কাজে লাগাতে পারে তাই আইনটি ও এর প্রয়োগ প্রণালী যতটুকু সম্ভব সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই বইটি স্থানীয় জনগণের জন্য খুব কার্যকরী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আইনটির ব্যবহার বাড়ানো ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বইটিতে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও অভিযোগ দায়ের-এর ফরম প্রদান করা হয়েছে।

আশা করছি, আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ সর্বসাধারণের কাজে আসবে এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ

(গণগবেষণা)

জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা

১. ভূমিকা

Participatory Action Research (PAR) কথাটা বাংলায় 'গণগবেষণা' বলেই পরিচিত হয়ে গেছে। এ ধরনের কাজে লিপ্ত হবার প্রেরণা আসে ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত প্রেরণা থেকে। আমার নিজের ক্ষেত্রে এই পথে উদ্যোগের মূলে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে দেখতে চাইতে এদেশের বীরোচিত জনগণ মুক্তিসংগ্রামের পর তাদের সমন্বিত সৃষ্টিশীলতা দিয়ে নিজেদের উন্নয়নের পথ গড়ে তুলবে।[১] স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কিছু গণ উদ্যোগের সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা এই প্রেরণাকে সুসংহত করে। এই সমস্ত উদ্যোগ এবং প্রথাগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় আমি নিশ্চিত হই যে, উন্নয়ন হতে হবে প্রধানতঃ "জনগণ দ্বারা", জনগণের পার্থিব সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত কম হলেও। এই ধারণা নিয়ে আমি জনগণের আত্মউন্নয়নের ক্ষেত্রে বাইরের লোকের ভূমিকা অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হই (রহমান, ১৯৯৪. খ)।[২] তৃণমূল পর্যায়ে মিথস্ক্রিয়া এবং পরীক্ষণ পরিচালনা এবং তা নিয়ে চিন্তা করা অর্থাৎ Praxis এর মাধ্যমে ক্রমে জনগণের আত্মউন্নয়নের জন্য বাইরের লোকের ভূমিকা সম্পর্কে আমার ধারণায় PAR কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। একই সাথে PAR এর বিভিন্ন মাত্রা এবং প্রশ্ন নিজেদেরকে উন্মোচিত করতে থাকে যা নতুন প্রত্যয়, ধারণা এবং প্রশ্ন সৃষ্টি করে এবং তাদের মীমাংসার তাগিদ দেয়। ফলে একজন পেশাজীবী অর্থনীতিবিদ থেকে **(গণ) জীবনের ছাত্র** রূপে আমার রূপান্তর ঘটে, যে ছাত্র কখনো কখনো জীবনকে চ্যালেঞ্জও করে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে। বর্তমান প্রবন্ধে জীবনের পাঠশালা থেকে আমার PAR শিক্ষার বর্ণনা এবং সাথে সাথে সামাজিক গবেষণায় এ ধরনের কর্মকান্ড সম্বন্ধে আমার ক্রমবিকাশমান প্রত্যয় ও ধারণাকে প্রকাশ করাই আমার লক্ষ্য।

---

১. সম্প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম পর্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থ সামাজিক রচনাবলী পড়ে একই বোধের প্রকাশ পেলাম, যেখানে তাঁর 'আত্মশক্তি' এবং একটি সৃষ্টিশীল জীব হিসাবে মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে, যা আমি আলোচনা করেছি আমার একটি সাম্প্রতিক রচনায় (রহমান, ২০০৩)। রবীন্দ্রনাথের এসব রচনা এবং একইসাথে গ্রামীণ বাংলায় গণ আত্ম-উন্নয়নকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভারতের কর্মগবেষণা এবং গণ অংশগ্রহণ ও আত্মনির্ভর চিন্তার শেকড় স্বরূপ। এটা উল্লেখযোগ্য যে, এক্ষেত্রে আমার নিজস্ব উদ্যোগও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

২. জনগণের আত্ম-উন্নয়নের 'আত্ম' এই পদটিকে আজ যখন আমি দেখি তখন তা অনাবশ্যক মনে হয়। 'উন্নয়ন' হচ্ছে একটি অর্গানিক প্রক্রিয়া যাকে সাহায্য করা যায় কিন্তু বাইরে থেকে তাকে আকার দেয়া যায় না। তা সত্ত্বেও আমার আলোচনায় গুরুত্ব দেবার জন্যে এই 'পদ'টিকে বাজায় রেখেছি।

২. আত্ম-নির্ভরতা এবং সামগ্রিক (holistic) সচেতনতা অভিমুখে

যে উন্নয়নের স্কুল থেকে আমি প্রশিক্ষিত হয়েছিলাম সেখানে 'উন্নয়ন সাহায্য' কে তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের আবশ্যিক উপকরণ হিসাবে দেখা হতো এবং আমিও সে ভাবেই ভাবতে শিখেছিলাম। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশে গণহত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আমাকে অন্য অনেক দেশবাসীর মত স্বাধীনতার পর যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন 'সাহায্য' সম্পর্কে বীতস্পৃহ করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যখন যুক্তরাষ্ট্র বাংলদেশে 'বন্ধু' হিসেবে এল 'উন্নয়ন সাহায্যের' প্রস্তাব নিয়ে তখন তার সাথে অবশ্যই কিছু স্পষ্ট এবং কিছু গোপন নিয়ন্ত্রণ-চিন্তা ছিল। অন্যদিকে দেশের অনেক স্থানে জনগণ এবং তরুণ-তরুণী বিদেশী শক্তির কাছে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ সমর্পন না করে উন্নয়নের অনেক সম্মানজনক পথ দেখতে চেয়েছিল। এই আকাংখা অনুরণিত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় পর্যায়ের কিছু উন্নয়ন কর্মকান্ডে। এইসব কর্মকান্ডে তারা একত্রিত হয়ে বাইরের সাহায্যের অপেক্ষা না করে নিজেদের যা কিছু ছিল তা নিয়েই উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৩] এদের মধ্যে একটি ছিল এক অভিনব স্বনির্ভরতার আন্দোলন যা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর জেলার ৬০ টি গ্রামে সূচিত হয়। এই আন্দোলন দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে সমস্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিজেদের যা আছে তাই নিয়ে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন উদ্যোগ নেয়। আমাদের মত দর্শনার্থীদের তারা বলে *"যদি আমরা বাইরে থেকে সহায়তা চাই তাহলে আমাদের প্রিয় নেতাকে বিদেশ থেকে ভিক্ষা করতে হবে। আমরা চাই না আমাদের জন্য তিনি অবমানিত হন এবং তাই আমাদের বাইরে থেকে কোন কিছুই চাওয়ার নেই।"* বলাবাহুল্য যে সব গ্রামবাসীরা এই আন্দোলনে অংশ নেয় তারা এক্ষেত্রে 'নেতা' শব্দটি জাতির প্রতীকরূপেই ব্যবহার করে, অর্থাৎ জাতির কোন অপমান তারা সহ্য করতে রাজী হয় নি। ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়ও এই স্বনির্ভর আন্দোলনে বহিঃ সাহায্য বিমুখতা বজায় ছিল, যদিও এই দুর্ভিক্ষ রংপুরেই সবচেয়ে তীব্রভাবে আঘাত করে। এই স্বনির্ভর গ্রামবাসীরা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য স্থাপিত সরকারী লঙ্গরখানাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের নিজেদের উদ্বৃত্ত খাবার একত্রিত করে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য যথোপযুক্ত সম্মানজনক কাজের ব্যবস্থা করে তার বিনিময়ে তাদের একবেলা খাবার দেয় যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে।

এমন একটি সমাজে যেখানে ঐতিহ্যগতভাবে সবাই পরনির্ভরতামুখী সেখানে এটি স্বনির্ভরতা সচেতনতার বিশুদ্ধতম নির্দশন। এই সচেতনতার উন্মেষ ঘটে আত্মনিয়ন্ত্রণের এক ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যা শেষ পর্যন্ত দেশে স্বাধীনতা এনে দেয়।

আমি এই ঘটনা থেকে তিনটি সত্য অনুধাবন করি ঃ

ক) কোন জনগোষ্ঠীর সম্পদের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন তারা যদি সেই সম্পদকে গতিশীলতা দেয় তাহলে অবশ্যই তারা এগিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে যারা বাইরের সাহায্যের আশায় বসে থাকে তারা হয় তাদের সময়

৩. এ ধরনের কয়েকটি উদ্যোগের একটি তথ্যকরণ করা হয়েছে রহমান, ১৯৯৭ - এ।

ও শক্তির অপচয় ঘটায় অথবা কোন মনিব/মক্কেল (patron/client) সম্পর্কের ফাঁদে আটকে পড়ে এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ বিসর্জন দেয় ।

খ) যে জনগোষ্ঠী নির্ভরশীলতা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত এবং যাদের বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ খুবই কম তাদের মধ্যেও স্বনির্ভরতা সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে যদি যথোপযুক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায় ।

গ) উন্নয়ন এমনকি অর্থনৈতিক উন্নয়নও - শুধু অর্থনীতির প্রশ্ন নয়, যদিও শব্দটিকে অর্থনীতি দখল করে ফেলেছে । এটি একটি সামগ্রিক (holistic) প্রশ্ন যে প্রশ্নে মনোবিজ্ঞান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

৩. উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে আরও কিছু কথা

যখন রংপুরে এই আত্মনির্ভরশীলতা আন্দোলন চলছিল প্রায় তখনই উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও থানার কচুবাড়ী কৃষ্টপুর গ্রামের কিছু কিশোর কিশোরী একটি সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলে । তাদের আন্দোলনের পদ্ধতিটি ছিল অভিনব । প্রতিদিন সকালে তারা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একত্রিত করতো এবং গ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে যেতো, যেমন *"টিপ্‌সই ছি, ছি, টিপ্‌ যদি দিতে চাও গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাও!"* শহরের বিভিন্ন অফিসে যেখানে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন কাজের জন্য টিপসই দিতে যেতো সেখানকার কর্মরত কেরানীদের কাছে যেয়ে তারা বলে যে তাদের গ্রাম থেকে যারা আসবে টিপসই দিতে তাদের যেন তারা বলেন এখন থেকে *"নাক সই" (nose sign)* দিতে এই বলে যে, *"স্বাধীনতার পরে নিয়ম বদলে গিয়েছে ।"* কেরানীরা সহযোগিতা করে এবং এর ফলে কচুবাড়ী কৃষ্টপুরের গ্রামবাসীরা এই অপমান সইতে না পেরে গ্রামে ফিরে গিয়ে কিশোর কিশোরীদের স্থাপিত সাক্ষরতা কেন্দ্রে ভর্তি হয় । এই "উন্নয়নের পথদিশারী" কিশোর কিশোরীরা মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক বৃদ্ধার কাছে যায় এবং তাকে বলে যে তাদের গ্রাম থেকে সেই বৃদ্ধা যদি নিরক্ষর হিসাবে পরকালের হিসাব খাতায় টিপ্‌সই করে তাহলে সেটা পুরো গ্রামের জন্য খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে । এটা তারা হতে দিতে পারে না এবং তাই মৃত্যুর আগে সেই বৃদ্ধার অবশ্যই লিখতে শিখতে হবে ।

এই অনন্য সাধারণ সাক্ষরতা অভিযান মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পুরো গ্রাম থেকে নিরক্ষতা দূর করে দেয় । এর ফলে দেশের সর্বপ্রথম নিরক্ষরতা মুক্ত গ্রাম হিসাবে কচুবাড়ী কৃষ্টপুর গ্রাম স্বীকৃত হয় । এক্ষেত্রেও এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক অভিযান – মানুষকে তাদের নিরক্ষতার জন্য সমাজের সামনে লজ্জা দেয়া । ফলে অতি স্বল্প অর্থনৈতিক সম্পদ সত্ত্বেও গ্রামের শিক্ষা উন্নয়ন সাধিত হয় । আরও লক্ষণীয় যে এটি ছিল একেবারেই তৃণমূল পর্যায়ের কিশোর কিশোরীদের একটি প্রচেষ্টা (যারা কেউ মাধ্যমিক পাশ করেছিল, কেউ ফেল করেছিল) । **এ থেকে প্রতিভাত হয় যে মানুষের সৃষ্টিশীলতা কখনই প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষানির্ভর নয় এবং সঠিক উদ্দীপনা পেলে শুধু সৃষ্টিশীলতা দিয়েই সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিতদেরকেও অতিক্রম করা যায় ।** এই ক্ষেত্রে এই শিক্ষিতদের মধ্যে ছিলেন দেশের

নামী দামী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা (যাদের মধ্যে আমিও একজন) যারা তখন ব্যস্ত ছিলেন এই হিসাব নিয়ে যে, আগামী 'ক' বছরে দেশের সাক্ষরতার হার 'খ' শতাংশ বাড়াতে হলে কতগুলো গণশিক্ষা কেন্দ্র, কতজন শিক্ষক, কতগুলি শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি লাগবে, এবং এই হিসাবে ফলাফল ছিল অবশ্যম্ভাবী ঘাটতি বাজেট যা নিয়ে বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর কাছে 'বৈদেশিক সাহায্যের' জন্য আমরা হাত পাততে যেতাম।

এই দুটি অভিজ্ঞতার ফলে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন নতুন পথে মোড় নেয়, এবং আমি একজন "প্রাক্তন অর্থনীতিবিদ" এ পরিণত হই, যে সবেমাত্র "জীবনের পাঠশালায়" ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছে।

এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি থেকে যায় সেটি হচ্ছে আমার মতো জীবনের পাঠশালার ছাত্ররা তাদের পূর্বশিক্ষা নিয়ে মানুষের আত্ম-উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারে কিনা। আমার পরবর্তী মাঠ-অভিজ্ঞতা ও তদজাত চিন্তা (praxis) থেকে ক্রমশ এই প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকি।

৪. গণনিয়ন্ত্রিত ত্রাণ বিতরণের ওপর "কর্ম গবেষণা"

১৯৭৪ এর মারাত্মক বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত একটি ত্রাণকর্মী দলের নেতৃত্ব দেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ত্রাণকার্য করতে। ক্ষুদ্র আয়ের বন্যাপীড়িত গ্রামের মানুষগুলো বেশ কয়েকদিন ধরে না খেয়ে ছিল। যতটুকু খাবার এবং অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম তা ছিল সমুদ্রে জল-বিন্দুর মতো। আমি ঠিক করলাম এতো কম ত্রাণসামগ্রী এই পীড়িত মানুষগুলোকে বিতরণ করার কঠিন দায়িত্বটা আমাদের নয়, তাদেরই নিতে হবে।

প্রথম গ্রামে নৌকা ভিড়ানোর পর শত শত মানুষ পাগলের মতো আমাদের দিকে ছুটে আসে। আমি তাদের বলি যেন তারা নিজেরাই সবচেয়ে ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষগুলোকে চিহ্নিত করে। বড়রা তাদের বাচ্চাদের এগিয়ে দেয় এই বলে যে তারা দুই, বা তিন দিন ধরে অভুক্ত আছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে কোন ঘরের বাচ্চা যদি চারদিন ধরে না খেয়ে থাকে তাকে কি সবার আগে সাহায্য করা প্রয়োজন নয়? আস্তে আস্তে গ্রামবাসীরা সুর বদলাতে লাগলো এবং নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে তীব্র বির্তকে লিপ্ত হলো যে কার আগে ত্রাণসামগ্রী পাওয়া উচিৎ। শেষে তাদের মধ্যে কয়েকজন একটি পরিবারকে সনাক্ত করলো যার সদস্যরা বন্যার কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পুরো জনতাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এই প্রস্তাবে তাদের কোন দ্বিমত আছে কিনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে বলতে এর থেকে বেশি পীড়িত কোন পরিবারকে তারা মনোনীত করবে কিনা। আমি তাদের বললাম সর্বসম্মতিক্রমে একটি পরিবারকে নির্বাচিত করতে সবার আগে তার সাহায্য পাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে একটি মতামত পাওয়া গেলো এবং প্রথম ত্রাণ সামগ্রী সেই পরিবারটি পেল। এরপর পরবর্তী পরিবারটির কথা জিজ্ঞেস করাতে এবারও সকলে মিলে একটি পরিবারকে চিহ্নিত করলো। ঐ গ্রামের মাত্র

৪টি পরিবারকে আমরা সাহায্য করি এবং তারপর জানাই যে, আমাদের ত্রাণসামগ্রী এতো কম যে, এবার আমাদের অন্যান্য গ্রামগুলোর সবচেয়ে পীড়িত মানুষগুলোর সাহায্যার্থে যেতে হবে। আমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস করলাম যে তাদের মতো পীড়িত আর কোন গ্রামগুলি আছে। সকলেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে। আমরা তাদের রেখে চলে আসি, অনেকেই তাদের মধ্যে অভুক্ত থেকে যায়। সকল গ্রামবাসীরা তীরে এসে আমাদের এই সবচেয়ে নিঃস্বদের সাহায্য করার প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানায়।

পরবর্তী তিনটি গ্রামেও আমরা ঠিক একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। এই গ্রামগুলির একটিতে একজন অবস্থাসম্পন্ন গ্রামবাসী আমাদের প্রায় ২০ জনের পুরো দলকে দুপুরের খাবারে দাওয়াত করেছিলো। বার বার জিজ্ঞেস করছিলো "সারা সকাল ত্রাণকার্য করে কি আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত নই?" শেষে থাকতে না পেরে আমি বল্লাম, *আপনার লজ্জা করে না? আপনার বাড়ীতে বেশী খাবার থাকলে আমাদের না সেধে কি আপনারই গ্রামের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর মধ্যে তা বিতরণ করা উচিৎ নয়? আপনি তো জানেন যে আমরা ভালোই খাচ্ছি পরছি।"* লোকটা চুপ করে থাকলো এবং আমরা যখন গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবারগুলোকে খুঁজছিলাম, তখন আমাদের সাথে সাথে ঘুরলো। যখন আমাদের কাজ শেষে আমরা নৌকায় উঠছিলাম লোকটা আমাদের কাছে এসে বললো- *"আপনারা অন্য রকম মানুষ, খোদা আপনাদের সহায় হোন"।*

অন্য আর একটি গ্রামে আমরা সব মহিলাদের জড়ো করে জানালাম যে তাদের গ্রামে দেবার মতো মাত্র দুটো শাড়ি আমাদের কাছে আছে। কাদেরকে সেই শাড়ি দুটো দেওয়া উচিৎ হবে তা জানার জন্য আমরা তাদের সাহায্য চাইলাম। প্রথমে সকলেই নিজের জন্য শাড়ি চাইতে লাগলো। দেখাতে লাগলো নিজেদের শতছিন্ন শাড়িগুলো যা দ্বারা লজ্জা নিবারণের কাজ সামান্যই হচ্ছিলো। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম এমন কোন বড়ো মেয়ে আছে কিনা যারা বাইরে এসে শাড়িও চাইতে পারছে না কারণ তাদের গায়ে দেবার মত কিছুই নেই। যদি এরকমই হয় তাহলে "আপনারা তো তাদের খালা, আপনাদের কি উচিৎ নয় আমাদের বলা সেই মেয়েগুলিকেই শাড়িগুলি দিতে?" আমাদের সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো এক মহিলা অবিশ্রান্তভাবে একটি শাড়ি চেয়ে যাচ্ছিল। এই কথা শুনে সে মুখ নিচু করে তার শাড়ীর আঁচলটা আঙ্গুলে একবার এদিক আর একবার ওদিক প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বিড় বিড় করে কথা বলতে লাগলো, যেন নিজেরই দুই সত্ত্বার সাথে বোঝাপড়া করছে। শেষ পর্যন্ত সে বল্লো *"ঐ খানে কুঁড়ে ঘরে দু'টা সমথ মেয়ে আছে যাদের গায়ে কিছুই নেই। তারা তাই বাইরেও আসতে পারছে না। তাদেরকে শাড়ীগুলো দেন আমি চাই না।"* অন্য মহিলারাও মাথা নিচু করে সম্মতি জানালো, আমাদের কাজও সাঙ্গ হলো।

এই ক্ষণকালীণ 'কর্ম গবেষণা' আমাদের শিখিয়েছিলো—

ক) যখন ত্রাণ সামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তখন <u>জনগণদ্বারা</u> <u>বিতরণ</u> পদ্ধতিই ত্রাণ সামগ্রি বিতরণের সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক উপায়। বাইরের

মানুষদের যাদের এই দায়িত্ব নেবার কোন যোগ্যতা নেই তারাও এরকম গুরু দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে।

খ) এ ধরনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে যারা অভ্যস্ত নয় তাদের কিছু আহ্বান/নেতৃত্ব/চ্যালেঞ্জ/উজ্জীবন দরকার যাতে তারা স্বার্থপরতা থেকে বের হয়ে একটি সামগ্রিক/গণতান্ত্রিক/নৈতিক পদ্ধতি খুঁজে বার করতে পারে। এটিও একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া।

৫. জীবনের পাঠশালায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্কুল

পেশাগত বুদ্ধিজীবীদের মাঝে আমারই মতো "জীবনের পাঠশালা"র ছাত্র খুঁজতে গিয়ে ভারতের নিরঞ্জন মেহতা[৪] এবং শ্রীলঙ্কার জি. ভি. এস ডি সিলভার সাথে (ভালবেসে আমরা তাকে জি. ভি. বলে ডাকতাম) আমার গভীর সখ্য গড়ে উঠে। আমরা ঠিক করলাম ১৯৭৬ এর শেষ দিকে একত্রিত হয়ে আমরা স্বনির্ভরতার উপর একটি বই লিখবো। কিন্তু জি. ভি সেপ্টেম্বরের দিকে আমাকে চিঠিতে জানালো যে আমাদের সঙ্গে এই কাজে সে যোগ দেবে না, কারণ সে শুধু *স্বনির্ভরতার স্বপ্নই দেখেছে, কখনও বাস্তবে দেখেনি।* শুধুমাত্র বিমূর্ত চিন্তা নয় বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি কি দারুন শ্রদ্ধা! তখন আমরা এই প্রজেক্টটা বাতিল করে দেই, এবং ভারতের মুম্বাই এর কাছে পালঘর তালুকে ভূমিসেনা নামে আদিবাসীদের একটি আন্দোলন এবং সংগঠনের সাথে নিরঞ্জনের যোগাযোগ থাকায় এই আন্দোলনের ওপর একসাথে স্টাডি করতে যাই। এই আন্দোলনের মাধ্যমে নির্যাতনকারী মহাজনদের (যাদেরকে *'সাহুকার'* বলা হতো) বিপক্ষে সেখানকার আদিবাসীরা যাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং যারা প্রকৃত অর্থে দাস হয়ে গিয়েছিল তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ জাহির করছিল (ডি, সিলভা, মেহতা, উইগ্নারাজা এবং রহমান, ১৯৭৯)।

লক্ষ্মী না সরস্বতী ?

- *তোমরা কি জান লক্ষ্মী কে আর সরস্বতী কে?*
- *অদিবাসী ঃ হ্যাঁ।*
- *লক্ষ্মী কে?*
- *আদিবাসী ঃ ভাত, কাপড়, ঘর*
- *আর সরস্বতী ?*
- *আদিবাসী ঃ সাহকারের জ্ঞান*

৪. পরবর্তীতে মুম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের পরিচালক।

- *যদি শুধু একজনকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে তোমরা কাকে বেছে নেবে ?*
- *আদিবাসী ঃ সরস্বতীকে ।*
- *কেন?*
- *আদিবাসী ঃ যদি সবার কাছেই জ্ঞান থাকে তাহলে কেউ কাউকে ঠকাতে পারবে না । তখনই সতিকারের সমতা আসবে ।*

পালঘর এর অত্যাচারিত আদিবাসীরা তাদের পার্থিব দারিদ্র্য দূরীকরণের চেয়ে জ্ঞান অর্জনকে কতখানি গুরুত্ব দেয় তার খন্ডচিত্র এই কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাই মুম্বাই পৌছানোর পরপরই । যখন আমরা তাদের নেতাদের সাথে এই আন্দোলনের ব্যাপারে কথা বলতে বসি, তারা তীব্রতার সাথে বলেন- "আমাদের বাইরের সাহায্য দরকার, কিন্তু তা শুধু আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ ও বোঝবার জন্য, আমাদের কি করা উচিৎ তা বলে দেবার জন্য নয় ।

> **"বাইরের মানুষ যে তৈরী সমাধান আর উপদেশ নিয়ে আসে সে এমনকি অকেজোর চেয়েও বেশী অপদার্থ । তাকে প্রথমে বুঝতে হবে আমাদের প্রশ্নগুলো কি এবং প্রশ্নগুলো আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে আমাদের সাহায্য করবে এবং তারপর সমাধান খুঁজতে আমাদের সাহায্য করবে । বাইরের মানুষদেরও বদলাতে হবে । সেই কেবলমাত্র বন্ধু যে আমাদের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের নিজেদেরকেই চিন্তা করতে সাহায্য করে ।"** (রহমান ২০০০, ৩৩)

এই 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে' আমার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা অত্যাচারিত মানুষদের **বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতার** আকুতি । এছাড়া তাদের এই স্পষ্ট বক্তব্য যে তাদের **বাইরের মানুষের সাহায্য দরকার বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা লাভের জন্য, তাদের সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার জন্য নয় ।**

এই ভাবে বাইরের থেকে আসা বন্ধুদের মূল ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়ে ভূমিসেনার নেতারা PAR-এর একটি মৌলিক কাজ চিহ্নিত করেন ।

- **"লোক চেতনা জাগরণ"**

পুনা ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশনের একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী দত্ত সাভ্লে ভূমিসেনাদের সাথে এনিমেটরের কাজ করছিলেন । এছাড়া একজন স্নাতক, নাগেশ হালকার এই সংস্থার একজন কর্মী হিসেবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছিলেন । ইনি যদিও প্রথমে ছিলেন একজন বাইরের লোক, কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি ভূমিসেনাদের সাথে মিশে যান । আদিবাসীদের চেতনা জাগরণের জন্য ভূমিসেনার পদ্ধতি ছিল—

ক) *'শিবির'*-এর আয়োজন করা যেখানে অত্যাচারিত আদিবাসীরা ৪০ জনের মতো সংখ্যায় একেকটা দল হিসাবে একত্রিত হতো। প্রথমে তারা তাদের উপর চালানো অত্যাচারের অভিজ্ঞতা একে অন্যের কাছে বর্ণনা করতো। এর পরে তারা সামাজিক কাঠামোগত অবস্থার বিশ্লেষণ করতো যার ফলে সকলেই একই রকমের অত্যাচারের শিকার হচ্ছিল। এর পরে তারা আলোচনা করতো কিভাবে একসাথে তারা এই অত্যাচারের মোকাবেলা করতে পারে যেহেতু একসাথেই তারা এরকম একটা কাঠামোর অত্যাচারের শিকার হচ্ছে।

খ) এই শিবির-প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরা 'সচেতন' হয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের স্থানীয় অত্যাচারের মোকাবেলা করতো। কোন "কেন্দ্র" ছিল না তাদের আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। নির্দিষ্ট সময় পর পর তারা একত্রিত হতো যাতে একে অন্যের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এর মাধ্যমে যদি তারা সম্মিলিতভাবে কোন আন্দোলনের ডাক দিতে চাইতো তাহলে তা হতো সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক, বিকেন্দ্রিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত, এবং এক্ষেত্রে 'কেন্দ্র' অর্থাৎ 'ভূমিসেনা'-র ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র অনুঘটক (catalyst) এবং সহায়তাকারী হিসাবে। একত্রিত চিন্তাধারা এবং আন্দোলনের এই চক্রের ফলে জনমানুষের প্রাক্সিস-অর্থাৎ কাজের উদ্যোগ নেয়া, উদ্যোগের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা, আবার উদ্যোগ নেয়া-বিকাশলাভ করে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা। এই প্রক্রিয়াকেই এই আন্দোলনে "লোক চেতনা জাগরণ" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৫]

▪ স্বনির্ভরতার অর্থ

স্বনির্ভরতা ছিল ভূমিসেনা আন্দোলনের একটি মৌলিক প্রত্যয়। সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পার্থিব উভয় ধরনের স্বনির্ভরতাই তাদের কাছে আবশ্যিক বলে মনে হয়। তাদের কাছে স্বনির্ভরতা মানে *স্বয়ংসম্পূর্ণতা* ছিল না, বরং এটা ছিল মানসিক এবং পার্থিব স্থিতি শক্তির এমন একটা মিশ্রণ যার দ্বারা বহিঃশক্তির কর্তৃত্বকে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু প্রাথমিক ধীশক্তির পথনির্দেশনা, এবং তীব্র অভাবের ক্ষেত্রে বস্তুগত সাহায্যের জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করতো। ভূমিসেনার কাছে স্বনির্ভরতা ছিল একটি (মানবিক) "আত্মা"-র প্রতিরূপ যে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করতে চাইতো, চাইতো নিজের অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু তার জন্যে দরকার ছিল একটা 'দেহ' (মস্তিস্ক ও অন্যান্য অবয়ব) এবং পরিবেশ যার সীমাবদ্ধতাগুলি কেবল মাত্র সময়ের সাথে সাথে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল। এই সব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভরতার আত্মাকে মিলিত হতে হবে সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তি অর্থাৎ বহিঃসাহায্যের

৫. এটি পাওলো ফ্রেইরির "সচেতনতা সৃষ্টি" (conscientization) প্রত্যয়ের সগোত্র। যদিও এখানে সচেতনতা সৃষ্টির পদ্ধতি হিসাবে শুধু সাক্ষরতা নয় বরং সরাসরি জনগণ দ্বারা সামাজিক বিশ্লেষণই ব্যবহৃত হয়েছে।

উপর নির্ভরতার সাথে, এবং তাই তাকে থাকতে হবে সদা সতর্ক এবং লক্ষ্যে অবিচল। স্বনির্ভরতা ছিল এমন আকুতি যা চাহিদার ব্যাপারে ছিল আপোষহীন, কিন্তু কখনও কখনও চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়ায় আপোষ করাটা দরকার হয়ে পড়তো।

স্বনির্ভরতার এই চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরের যারা জনগণের এ ধরনের স্বনির্ভরতা লাভে সহায়তা করতে চায় তাদের ভূমিকার ওপর একটি চ্যালেঞ্জ আসে। কারণ এ ধরনের সহায়তায় নিজেকে ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় করে ফেলা (self-liquidating) আবশ্যিক, যে কারণে এই সহায়তা নির্ভরতা বাড়াবে না কমাবে এ সম্বন্ধে গভীর স্পর্শকাতরতার প্রয়োজন। এ প্রশ্নটি স্পষ্ট করে সামনে আনা প্রয়োজন যাতে উভয়পক্ষই এ ব্যাপারে সর্বক্ষণ পর্যালোচনা করতে পারে।

▪ "প্রতিশক্তি" হিসেবে গণশক্তি

আমরা এর সাথে সাথে মানুষের **ক্ষমতায়নের** প্রকৃত অর্থও অনুধাবন করি। ভূমিসেনা বুঝতে পেরেছিলো যে মানুষের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন এই গণশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তারা এটাও জানতো যে, এই শক্তির প্রকৃত প্রয়োগের জন্য এরকম সংস্থার অনুশাসনের বাইরে জনগণের স্বাধীন শক্তিরও প্রয়োজন।

প্রকৃত গণশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, এমনকি জনগণের তৈরি কোন সংস্থারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের সংস্থাকেও জনগণ প্রশ্ন করতে পারে যদি সেই সংস্থা কর্তৃত্বপরায়ন প্রবণতা দেখায়। এই অর্থে জনগণের শক্তি শেষ বিচারে জনগণের 'প্রতিশক্তি' (countervailing power)। এই শক্তি তাদের নিজস্ব সংস্থার মাধ্যমে তাদের ওপর প্রভূত্ব করতে চায় এরকম অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। *কিন্তু যদি দরকার পড়ে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধেও এই শক্তি লড়তে প্রস্তুত থাকবে।* পরবর্তীতে আমি এই ধারণাটি এইভাবে ব্যক্ত করি যে, *জনগণের শক্তি যা শেষ বিচারে* "প্রতিশক্তি", *"এটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শক্তির (তা অন্যদের বা জনগণের নিজেদের যারই হোক না কেন) অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণের জীবন্ত সম্মিলিত সচেতনতা, সদাসতর্কতা, এ ধরনের অপব্যবহার প্রতিরোধের সক্ষমতা, এবং যদি অনুষ্ঠানিক শক্তি বিপথগামী হয় তাহলে জনগণের ইচ্ছার স্বীকৃতি আদায়-জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই কথা প্রতিষ্ঠিত করা যে জনগণ অংশগ্রহণ করবেই।* (রহমান, ১৯৮১, ৪৫, রহমান ২০০০, ১১৬)

৬. ভূমিসেনার সাথে সহ-গবেষণা

যখন আমরা ভূমিসেনার সাথে কাজ করছিলাম সেই সময় "গণগবেষণা"- Participatory Research বা PR (তখন এই নামেই বেশী পরিচিত ছিল)- একটি "স্কুল" বা ধারা চারদিকে পরিচিত হয়ে উঠছিল প্রধানত কানাডার টরন্টোতে অবস্থিত International Centre of Adult Education এবং লাতিন আমেরিকার অরল্যান্ডো

ফালস্ বর্দা এবং তার সহকর্মীদের কাজের মাধ্যমে। এরকম গবেষণার দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা চাইলাম ভূমিসেনার স্টাডিটি এই দর্শন নিয়ে করবো। ভূমিসেনার নেতাদের আমরা এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা সম্মতি জানান। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কখনও আলাদা আলাদা, কখনও দলগতভাবে আমরা আন্দোলনটিকে পর্যবেক্ষণ করি, ভূমি সেনার নেতা ও কর্মীদের সাথে তাদের "শিবিরগুলোতে" (সচেতনতা ক্যাম্প) বসি, তাদের সাথে নানান কর্মশালার মাধ্যমে তাদের আন্দোলন আলোচনা করি। ভূমিসেনা কর্মীরা তাদের এই কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে মারাঠী ভাষায় তথ্য সংগ্রহ করে, আমরা সেগুলো অনুবাদ করে নেই। শেষে আমাদের স্টাডির একটা খসড়া প্রস্তুত করে তা আমরা ভূমিসেনা নেতাদের দেই তাদের মতামত এবং অনুমোদনের জন্য। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি আমরা স্টাডিটা ছাপাতে পারি কিনা এবং ছাপালে তারা আমাদের সঙ্গে সহলেখক হবেন কিনা। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেন এবং আমাদের জানান যে আমাদের গবেষণা এবং এতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদের আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। তারা কি করছেন এটা বুঝতে এবং এগিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজে নিতে এই গবেষণার অবদান রয়েছে। তারা এখন আদিবাসীদের মধ্যে মারাঠীতে লিখিত তাদের নিজস্ব মুখপত্র বিলি করতে পারছেন যা এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমেই প্রস্তুত হয়েছে, এবং আমাদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছেন। তারা কিছু সম্পাদনার পর গবেষণাকর্মটি ছাপাতে দিতে রাজি হলেন এই বলে যে এর ফলে বাইরের অনেক মানুষ তাদের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হতে পারে। কিন্তু সহলেখক হবার ব্যাপারে তারা আগ্রহ দেখালেন না।

"তোমাদের বন্ধু হবার দরখাস্ত আমরা গ্রহণ করলাম"!

যাবার আগে আমি তাদের জিজ্ঞেস করি তারা আমাদের বন্ধু হিসেবে নেবেন কিনা। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং হেসে বলেন— **"তোমাদের বন্ধু হবার দরখাস্ত আমরা গ্রহণ করলাম"!** শুভাকাঙ্খী, বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হয় এরকম বাইরের মানুষদের প্রতিও তাদের কি গভীর সতর্ক অবস্থান এবং একই সাথে আত্ম নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্পের কি দৃঢ় তথাপি সহজ ঘোষণা!

ভূমিসেনা সম্পর্কে আমাদের স্টাডিটি পড়বার পর থেকেই অরল্যান্ডো ফালস্ বোর্দা এবং আমার মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সূচনা হয়। আমরা দুজনেই মনে করি আমার মাধ্যমিক পর্যায়ের এই শিক্ষা PAR এর মূল নীতিগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়। (ফালস্ বোর্দা ২০০২, ২৭)

৭. "উজ্জীবক"দের সংবেদনশীল করবার (sensitization) প্রক্রিয়া -শ্রীলঙ্কা

ভূমিসেনার স্বনির্ভরতা দেখার পর জি ভি আমাদের জানালো "আমি এ ব্যাপারে লিখব না, আমি এটা করে দেখাবো।" এর ফলে ১৯৭৭ সালে শ্রীলংকায় জি ভি একটি প্রজেক্ট হাতে নিল যার নাম "Cadre Training and Action Research in Self-reliant Rural

Development (স্বনির্ভর গ্রামীণ উন্নয়নে কর্মী প্রশিক্ষণ এবং কর্ম গবেষণা)। নিরঞ্জন মেহ্তা ও আমি কলম্বোতে সাত দিনের একটা প্রাথমিক কর্মশালায় যোগ দেই যেটির লক্ষ্য ছিল "এনিমেটর" বা "উজ্জীবক"দের সংবেদনশীল করে তোলা। আমার পর্ববর্তী একটি লেখায় আমি এনিমেটর কথাটি এইভাবে বুঝিয়েছি (রহমান ১৯৯৪ঘ, ১৫৬) ঃ

"তৃণমূল কাজে এনিমেশন কথাটি তার আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ীই বঞ্চিত মানুষদের নিজেদেরকেই তাদের নিজেদের জীবনের কর্ণধার হিসেবে মনে করতে, অন্য কোন সামাজিক শ্রেণীর নীচে নয়, এনিমেট বা উজ্জীবিত করা বোঝায়। যেন তারা আত্ম-মর্যদাবোধ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের জীবনের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা লাভ করে এবং যেন জীবনের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে নিজেদের জাহির করতে পারে, আদায় করে নিতে পারে নিজেদের অধিকারের স্বীকৃতি। এই ধারণার প্রধান প্রেরণা মানুষকে সৃষ্টিশীল হিসেবে গণ্য করা এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার প্রকাশ দেখতে চাওয়া, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পরনির্ভরতা এবং মানসিক উদাসীনতার শিকার হয়ে পড়ে যার ফলে অন্য সামাজিক অবস্থায় তাদের পক্ষে যতটা সৃষ্টিশীলতার অনুশীলন করা সম্ভব হতো এক্ষেত্রে তা হয় না। সুবিধাবঞ্চিতদের একা একা নয় বরং একত্রিত হয়ে সমস্যা সমাধান বা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদের সৃজনশীলতা ব্যবহারের সুযোগ অধিকতর। তাই উজ্জীবনা প্রদানের একটি প্রধান লক্ষ্য মানুষের মধ্যে একাত্মতাবোধ এবং ঐক্য সৃষ্টি করা।"[৬]

আমাদের ধারণা ছিল সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বনির্ভরতা উন্মোচনের চাবিকাঠি হচ্ছে যথোপযুক্তভাবে প্রণোদিত এবং সংবেদনশীল "উজ্জীবক"। যিনি নিজে (বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে) স্বনির্ভরতার অভিজ্ঞতা পেয়েছেন এমন একজন উজ্জীবকই পারেন এই ধারণা মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত করতে। **অর্থাৎ উজ্জীবক হবেন এমন একজন যাকে কেউ জ্ঞান-বুদ্ধি শেখায়নি বরং যিনি নিজেই আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্ঞান-বৃদ্ধি আহরণ করেছেন।** এই আত্মানুসন্ধান প্রক্রিয়া উজ্জীবককে এমন একটি চরিতার্থতা দেবে যা তিনি জনগণের

---

৬. পরবর্তীতে ILO-এর PORP প্রোগ্রামের আমন্ত্রণে ILO তে এসে তিলকারত্ন PORP এর গবেষণাকর্ম এবং তৃণমূল পর্যায়ের কাজের পর্যালোচনা করেন এবং উজ্জীবন এবং এর সহযোগী ধারণা সঞ্চালনকে (facilitation) ব্যাখ্যা দেন এভাবে-

"মানুষ তখনই উজ্জীবিত হয় যখন সে সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে নিজে নিজেই পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করতে পারে, তাদের অনুসন্ধান ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিকাশ লাভ করে, যখন সে চলমান জীবনধারার নানা কাজ সম্পর্কে পর্যলোচনা করার ক্ষমতা লাভ করে। আর তাই উজ্জীবনা প্রদানের লক্ষ্য হচ্ছে এই ক্ষমতাগুলো গড়ে তুলতে সহায়তা করা এবং তাদের বাস্তবতার পরিবর্তন করার জন্য এমন একটি জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তোলা যা দ্বারা তাদের চিন্তা ও কাজের সমন্বয় ঘটবে।" (তিলকারত্ন ; ১৯৮৭:২৩)

সঞ্চালন (facilitation) সম্পর্কে তিলকারত্ন বলেছেন- "উজ্জীবনা মানসিক বাধাগুলো ভেঙ্গে দিয়ে পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে, আর সঞ্চলনের (facilitation) কাজ হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বাস্তব বাধাসমূহ অপসারণে সহায়তা করা। বাইরের নানা "উন্নয়ন সংস্থা"-র সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক পদমর্যাদা এবং যোগাযোগের কারণে এ ক্ষেত্রে "resource person" হিসেবে এই ধরনের কিছু বাস্তব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারেন। (তিলকারত্ন ; ১৯৮৭:৩৫)

মধ্যেও সঞ্চালিত করতে চাইবেন। অপরদিকে যারা নিজেরা জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসন্ধান না করে অন্যদের কাছে থেকে "শিখেছেন" তাদের মধ্যে অন্যদেরও আত্মানুসন্ধানের জন্য উজ্জীবিত করার বদলে "শেখানোর" প্রবণতাই এসে যায়।

আগে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে জড়িত ছিল এমন কিছু কর্মী থেকে বাইশ জনকে আমরা এই "সংবেদনশীলতা প্রদান" প্রক্রিয়ার জন্য মনোনীত করি। তাদের প্রধানত দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বলা হয়েছিলো:

১) তাদের আগের কাজগুলো কেন মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে-সে সব প্রজেক্টের ধারণা, তাদের নিজেদের জনগণের সঙ্গে মেলামেশার প্রক্রিয়ায় কি ভুল ছিল, ইত্যাদি।

২) এখন যদি তাদের বলা হয় গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর হতে উজ্জীবিত করতে তাহলে তারা কিভাবে চেষ্টা করবে।

কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। নিরঞ্জন এবং আমি তাদের আরও জানাই যে যেহেতু আমরা শ্রীলঙ্কাবাসী নই, তাদের গ্রামীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানি না, তাই আমরা কেমন করে তাদের কোন পরামর্শ দেব।

এর ফলে হবু-উজ্জীবকরা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, এবং সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কিছু আপাত ধারণায় উপনীত হয়। এর পরে তাদের বলা হয় গ্রামে গিয়ে তাদের স্বচিন্তিত পদ্ধতিতে কাজ করতে এবং পারস্পরিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার করতে যে গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা কতখানি সফল হচ্ছে। কেউ কেউ এই পরীক্ষায় সফল হয়, কেউ হয় ব্যর্থ। সাধারণত এটাই দেখা যায় যে কোন বাস্তব কর্মপন্থা নেবার আগে যারা গ্রামবাসীদের নিজেদের জীবন ও জীবনের মান উন্নয়ন সম্পর্কে আত্মানুসন্ধানে প্ররোচিত করতে পেরেছে তারাই ভাল করেছে। (তিলকারত্ন, ১৯৮৭)

- **"তিনি আমাদের মগজ থেকে মরচেটা সরিয়ে দিয়েছেন।"**

একদল অত্যন্ত গরীব মহিলাদের কেসটি ছিল এই কাজের একটা চমৎকার উদাহরণ। তারা জীবিকার জন্য নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি প্রস্তুত করতেন। তাদেরকে প্রণোদিত করা হয় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য যে কেন প্রতিদিনের এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরেও তারা একই রকম গরীব রয়ে গেছেন এবং কিভাবে তারা এই দারিদ্রকে অতিক্রম করতে পারেন। উজ্জীবক নিজে তাদের এ ব্যাপারে কোন মতামত দিতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন যে এ প্রশ্নের উত্তর তাদের নিজেদের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই খুঁজে নিতে হবে। দড়ি উৎপাদনকারী মহিলাদের এই দলটি ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকেন এবং অবশেষে আবিষ্কার করেন তাদের

দারিদ্রের প্রধান কারণ। যে মধ্যস্বত্বভোগী তাদেরকে নারিকেলের আঁশ দিত কাঁচামাল হিসেবে সে তাদের কাছ থেকে দড়ি কিনে নিতো খুবই অল্প দামে কিন্তু বিক্রি করত তার থেকে অনেক বেশী মূল্যে। তারা দেখেন যে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভর না করে নিজেরা যদি তারা কাঁচামাল কিনতে যান তাহলে একটা চলতি পুঁজি (working capital) লাগবে যা তাদের কাছে ছিল না। তারা আরও দেখেন যে সাধারণত চুক্তিতে তাদের যে পরিমাণ দড়ি দেওয়ার উল্লেখ থাকে তারা তার থেকে বেশি পরিমাণ দড়ি তৈরি করতেন, কিন্তু যে মধ্যস্বত্ত ব্যবসায়ী তাদের দড়ির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে তার কাছেই তারা অতিরিক্ত দড়িটুকুও বেচে দেন সেই একই কম দামে। এটা বিশ্লেষণ করার পর তারা সিদ্ধান্ত নেন যে এর পর থেকে তারা অতিরিক্ত দড়িটুকু আর ব্যবসায়ীদের না দিয়ে নিজেরা সরাসরি বাজারে বেশি দামে বিক্রি করবেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এমনটি করার পর তাদের হাতে যথেষ্ট পুঁজি জমা হয় যার ফলে তারা সেই মধ্যবর্তী দালালের সাথে ব্যবসা করা বন্ধ করে দিতে পারেন। এর পর থেকে তারা সরাসরি বাজার থেকেই কাঁচামাল কিনতেন এবং দড়িও সরাসরি সেখানেই বিক্রি করতেন। তাদের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং তাদের নিজেদের গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের দড়ি উৎপাদনকারীদের মধ্যে এই উদ্যোগটা ছড়িয়ে পড়ে।

এই দৃষ্টান্তমূলক উজ্জীবনা প্রদান কাজের ওপর স্টাডি করতে গিয়ে তিলকারত্ন (তিলকারত্ন, ১৯৮৪) প্রথম দড়ি উৎপাদনকারী দলটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "উজ্জীবক আপনাদের কিভাবে সাহায্য করেছিলেন?"

> তারা জবাব দেন ঃ *"তিনি আমাদের মগজ থেকে মরচেটা সরিয়ে দিয়েছেন।"* **উজ্জীবকদের ভূমিকা সম্পর্কে এর থেকে ভাল, এর থেকে তীক্ষ্ণতর কোন জবাব আমার জানা নেই এবং এটা এসেছিলো সরাসরি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে থেকেই** - ***উজ্জীবক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের মগজ থেকে মরচে সরিয়ে দেন।*** এবং মরচে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি গণ আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেন যা এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তোলে, কারণ আত্ম-চিন্তন ছাড়া আত্ম-উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৮. মূলবোধ উজ্জীবিত করা - ফিলিপাইনের "সারিলাকাস"

আমার পরবর্তী শিক্ষা "সারিলাকাস" (আত্মশক্তি) নামে একটি কর্ম গবেষণা প্রকল্প থেকে যার সূচনা ঘটে ১৯৭৯ সালে ফিলিপাইনের চারটি গ্রামে। আমি এই প্রকল্পকে সাহায্য করি আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার (ILO) একটি প্রকল্প "PORP"-এর মাধ্যমে যেটি সম্বন্ধে পরে বলবো। সেখানকার উজ্জীবকরা চারটি গ্রামে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সংগঠন গড়ে তুলতে প্রণোদিত করে। এই সংগঠনগুলি বিভিন্নরকম যৌথ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের

উদ্যোগ নেয়, এবং ক্রমশ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা লাভ করতে থাকে। চারটি গ্রামের প্রতিটিতে একজন করে উজ্জীবক পূর্ণ-সময় কাজ করছিলেন। ১৯৮২ সালে প্রজেক্টের একটি পর্যালোচনায় আমি অংশগ্রহণ করি। প্রতিটি গ্রামের সংগঠনকে আমি প্রশ্ন করি:

"উজ্জীবকদের আপনারা কখন চলে যেতে দেবেন?"

প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে প্রথম যে উত্তরটা এসেছিলো তা হচ্ছে ঃ

"আমরা কেন তাদের যেতে দেব? তারা আমাদের এতো সাহায্য

করেন, আমরা তাদের ভালোবাসি।"

আমি আবার প্রশ্ন করি ঃ

"যদি তারা এতো ভাল আর সাহায্যকারী হয়ে থাকেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম। এই দেশের অন্যান্য গ্রামে আপনাদের মতো বহু মানুষের তাদের কাছে থেকে সাহায্য দরকার। অন্যান্য জায়গার স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের বঞ্চিত করে এদের ধরে রাখার কি অধিকার আপনাদের রয়েছে।"

এধরনের প্রশ্নের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না, তাই প্রতি গ্রামেই আমি তাদের প্রশ্নটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলি এবং বলি যে আমি তাদের কাছে দুই দিন পর আবার আসবো তাদের সুচিন্তিত মতামত নেবার জন্য।

পালা করে দুই দিন পরে আমি প্রতিটি গ্রাম পুনর্দশনে যাই। প্রতিটি গ্রামেই প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। তাদের উত্তর তখন ছিল এরকম-

"আপনার প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের উচিৎ এখন একে অন্যান্য গ্রামের মানুষদের সাহায্য করবার জন্য ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু আমরা এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত নই, এবং যদি তিনি সপ্তাহে একবার করে আমাদের এখানে আসেন তাহলে আমরা তার কাছ থেকে আরও কিছু শিখে নিতে পারি।"

অন্য একজন সদস্য দাঁড়িয়ে বলে-

"সপ্তাহে একবার নয়, ১৫ দিনে একবার দেখা করতে আসলেও চলবে।"

প্রতিটি গ্রামেই এই ধরনের উত্তর পাই। অর্থাৎ দেশের অন্যান্য স্থানে তাদেরই মতো সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সাথে একাত্মতাবোধ এবং তাদের সাথে উজ্জীবকদের ভাগ করে নেওয়ার আগ্রহের কাছে হার মেনেছে উজ্জীবকদের আঁকড়ে ধরে রাখবার প্রবণতা। একটি উন্নত মূল্যবোধ, যা ছিল সুপ্ত, এইভাবে জেগে ওঠে। এর থেকে আমি আরেকবার নিশ্চিত

হই (বাংলাদেশে ত্রাণ বিতরণ অভিজ্ঞতা স্মরণ করুন) যে, **গণমানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মূল্যবোধ রয়েছে যা হয়তো সবসময় প্রকাশ পায় না, কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো জাগিয়ে তোলা যায় তাদের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় দেখাতে চ্যালেঞ্জ করলে।**

"সারিলাকাস" এর উজ্জীবকরা আস্তে আস্তে এই গ্রামগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে দূরে সরে আসে, শুধু মাঝে মাঝে দেখা করতে যায়, তাদের সাথে গ্রামবাসীদের থেকে যায় মূলত একটি হৃদ্যতার সম্পর্ক। তারা অন্যান্য জায়গায় কাজ করতে আরম্ভ করে এবং শীঘ্রই তাদের এই কাজ একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। "সারিলাকাস" শেষ পর্যন্ত গীর্জাকেন্দ্রিক সংস্থাগুলির বাইরে দেশটির বৃহত্তম গণআন্দোলনে পরিণত হয়। **এ থেকে স্বল্পসংখ্যক উজ্জীবকদের মাধ্যমে উজ্জীবনার কাজের ভৌগোলিক বিস্তারের একটি স্ট্র্যাটেজী দেখা যায়, প্রত্যেক জায়গার মানুষদের তাড়াতাড়ি স্বনির্ভর হতে অনুপ্রাণিত করে যাতে পরে উজ্জীবকদের সাহায্য ছাড়াই তারা এগিয়ে যেতে পারে।**

৯. আরও কিছু গণগবেষণা

PAR-এ আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল ভূমিসেনা। এই অভিজ্ঞতা হওয়ার সময়ই, ১৯৭৭ সালে আমি ILO তে যোগ দেই এবং একটি নতুন প্রকল্প সৃষ্টি ও সমন্বয় করি যে প্রকল্পের অধীনে বেশ কিছু গণগবেষণা পরিচালিত হয়। এই প্রোগ্রামটির নাম ছিল Participatory Organizations of the Rural Poor, যা "PORP" নামেই অধিক পরিচিত। PAR সম্পর্কে আমার ধারণাগুলো PORP – এর কাজের অভিজ্ঞতার সময়ই পূর্ণতা লাভ করে। যে ধরনের গণ-গবেষণাকে আমরা উৎসাহিত করছিলাম যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণ-আত্মউন্নয়ন বা People's Self Development (PSD) - এর বিকাশ ঘটানো, এই ধরনের গবেষণায় বাইরের গবেষকদের সাথে গণ-গবেষকদের সম্পর্কটা হতো subject-subject ভিত্তিতে, অর্থাৎ উভয় পক্ষই গবেষণার 'মালিক'। এর ফলে এ ধরনের গবেষণা জনগণের আত্ম-উন্নয়নের জন্য কর্মপ্রচেষ্টার সাথে এক হয়ে যেতো। অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক গবেষণা থেকে এই ধরনের গবেষণাকে পৃথক করার জন্য আমরা "Particitpatory Action Research" অথবা এই পদটি ব্যবহার করা শুরু করি।

স্বভাবতই আগে থেকে 'PAR-এর গবেষণা-পদ্ধতি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা করা যায় না কারণ সেক্ষেত্রে subiect-subject সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারটা মিথ্যা হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকটি PAR এর ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতিটি তৈরি হয় অংশগ্রহণকারী গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বা তাদের নেতাদের যুগ্ম পরিকল্পনায়। নীচে PORP এর PAR প্রকল্পে যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতির বিকাশ ঘটে তার একটি দৃষ্টান্তমূলক স্যাম্প্‌ল পরিবেশন করছি।

৯ক. শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় যে এনিমেশন কাজের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর একটি PAR পদ্ধতিতে গবেষণা করানো হয় যার প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন তিলকারত্ন (তিলকারত্ন, ১৯৮৪)। এই গবেষণায় গ্রামের অনুসন্ধানপর্বগুলো পরিচালিত হতো এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত দুইটি গ্রামীণ ক্যাডার দলের মাধ্যমে। এই দল দুটি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতো সরাসরি গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে। এক্ষেত্রে কোন নিয়মমাফিক প্রশ্নপত্র ব্যবহার না করে তারা প্রধানত সরাসরি পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিতো। এই পর্যবেক্ষণের ফলে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি উপরোক্ত প্রচেষ্টায় জড়িত সব জনগণের সভায় পেশ করা হয়, এবং এর উপর ভিত্তি করে সবাই আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। এই আলোচনায় গ্রামবাসী ক্যাডারদের দলদুটি এবং বাইরের কিছু গবেষক অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের সম্মিলিত আলোচনায় এমন কিছু বিষয় উঠে আসতো যে সম্পর্কে গ্রামবাসীরা পূর্বে চিন্তা করেননি। এর ফলে এ বিষয়গুলোতে তাদের সম্মিলিত সচেতনতা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার উন্নতি ঘটে এবং গবেষণা শেষ হওয়ার পরও তাদের আলোচনা চলতে থাকে। এই আলোচনা তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও কাজের ধারাকে প্রভাবিত করে।

৯খ. ভারত

ভারতের মহারাষ্ট্রের আদিবাসী কৃষক আন্দোলনের সাথে জড়িত সমাজকর্মী/এ্যাকটিভিস্টগণ PAR-এর একটি ভিন্ন মডেল তৈরি করেন (Paranjape et al, 1984)। গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় আন্দোলনের স্বনির্ভর উন্নয়ন-প্রচেষ্টার মধ্যেকার বিভিন্ন স্ববিরোধিতা, এবং এমনভাবে এই অনুসন্ধানটি বিকশিত হয় যাতে তা শুধু গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আন্দোলনের হাতিয়ারও হয়ে ওঠে। এই গবেষণা পদ্ধতিটির ভিত্তি ছিল কিছু কর্মশালা। প্রথমে এই কর্মশালার জন্য বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় কিছু প্রধান প্রধান বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের জন্য। বিষয়গুলোর উদাহরণ: ব্যক্তি স্বনির্ভরতা বনাম যৌথ স্বনির্ভরতা, বৃহত্তর আন্দোলনে বিষয়-ভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট হিসেবে অংশগ্রহণ বনাম বৃহত্তর কোন সংস্থার সাথে স্থায়ী সংযুক্তকরণ ইত্যাদি। এই ধরনের দুই মেরুতে অবস্থান এবং বিতর্কের ফলে অংশগ্রহণকারীরা তাদের আন্দোলনের স্ববিরোধিতা এবং বিকল্প পথগুলো সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে, এবং এটাও বোঝে যে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট পথ বেছে নেওয়া কতটা জরুরী। এই ধরনের যেসকল বিষয়ে বিতর্ক চলে তার মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে এই অংশগ্রহণমূলক গবেষণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়ে যায়। এছাড়াও এর ফলে যে উচ্চতর সচেতনতার সৃষ্টি হয় তা আন্দোলনের অন্যান্য স্ববিরোধিতাগুলো সম্পর্কেও সচেতন অথবা অসচেতনভাবেই মীমাংসায় পৌঁছাতে সহায়তা করে। এই গবেষণা প্রতিবেদনটি স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হয় যাতে তা আন্দোলনের কাজে আসে।

৯গ. ফিলিপইন

অন্য একটি PAR গবেষণা পদ্ধতি নেয়া হয় ফিলিপাইনে নারী অভিবাসীদের একটি আন্দোলনে (Women's Research Committee, et al, 1884)। আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত একটি একটিভিস্ট সংস্থা একটি গবেষণা সমন্বয়কারী টীম গঠন করে। এর মধ্যে দুইজন ছিলেন নারী অভিবাসীদের ১৪ সদস্যের "ভ্যানগার্ড গ্রুপ" থেকে আগত এবং দুইজন ছিলেন উক্ত সংস্থার সদস্য। ভ্যানগার্ড গ্রুপের কাজ ছিল নারী অভিবাসীদের সাপ্তাহিক সভার সুক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুসন্ধানের জন্য তুলে ধরা, নারীদের জীবনের নানা দিক এবং সংগ্রাম, নারী সংগঠনটির ইতিহাস, ভ্যানগার্ড গ্রুপের কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত করা। এই সব বিষয়ের ওপর গবেষণার ফলাফল দুটো নাটকের মধ্যে ধারণ করা হয়। সকল অংশগ্রহণকারী মহিলাদের এই নাটক দুটো দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয় যাতে তারা প্রাপ্ত তথ্যকে পরীক্ষা করে তাতে প্রয়োজনীয় অদলবদল করে তাকে বৈধতা দিতে পারে। শেষ পর্যায়ে এই গবেষণা কর্মের সুফল সম্পর্কে আলোচনা হয় যেখানে স্বীকৃত হয় যে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের ফলে ভ্যানগার্ড গ্রুপটি তার প্রথম দুই বছরের সাংগঠনিক প্রচেষ্টার একটি পর্যালোচনা করতে পেরেছে, এবং এ থেকে তাদের আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পেরেছে। এছাড়া আরও একটি ব্যাপারে এই গবেষণা প্রকল্পের ভূমিকা ছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমেই, বিশেষকরে ভ্যানগার্ড গ্রুপের সদস্যরা, তাৎক্ষণিক স্থানীয় (মাইক্রো) ইস্যুগুলো বৃহত্তর পরিসরের (ম্যাক্রো) ইস্যুর পরিপ্রেক্ষিতে বোঝবার দক্ষতা অর্জন করে।

৯ঘ. ভারত

ভারতের অন্য একটি প্রজেক্টে PAR একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এই প্রজেক্টে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বন-কেন্দ্রিক কয়েকটি গণআন্দোলন এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থা একত্রিত হয়ে "বন, পরিবেশ এবং অত্যাচারিত" এই বিষয়ের উপর যুগ্ম অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। এই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ছিল নয়া দিল্লীর The People's Institute for Development and Training. উক্ত বিভিন্ন আন্দোলন ও সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রথমে ১০ দিন ব্যাপী একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে যেখানে এই অনুসন্ধানের রূপরেখা এবং বনভিত্তিক মানুষের ধারণাবলী রেকর্ড করার পন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এর পরে তারা নিজে নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালায়। প্রতি এলাকায় এই গবেষণা চলার সময় অন্য এলাকাগুলির দুইটি অংশগ্রহণকারী আন্দোলন/সংস্থার সদস্যরাও এই এলাকা ভিজিট করে যান। এইভাবে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ একটি ক্ষুদ্রতর গবেষক দলের কাছে পাঠানো হয়। এই দলের সদস্য ছিলেন এই আন্দোলনের সাথে জড়িত কিছু সামাজিক একটিভিস্ট গবেষক যারা এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং এই আন্দোলনের বিভিন্ন জায়গায় যারা ঘুরে বেড়িয়েছেন তাদের সাক্ষাৎকার নেন। এর উপর ভিত্তি করে পূর্বোক্ত গবেষক দলটি সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন ও

সংঘাত নিয়ে কিছু কেস ষ্টাডি, একেকটি সমস্যার বিষয়-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং একটি বিশ্লেষণী রচনা প্রস্তুত করেন। এই রচনাটি দ্বিতীয় একটি কর্মশালায় পেশ করা হয় যেখানে প্রথম কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল দল উপস্থিত ছিল। এই কর্মশালার পরামর্শগুলো সমন্বয় করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয় (দাসগুপ্ত, ১৯৮৬)।

৯ঙ. নিকারাগুয়া

সম্পূর্ণ ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালে নিকারাগুয়ার *এল রিগাদিও* অঞ্চলে একটি PAR প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় (দ্য মন্তিস, ১৯৮৭)। এই PAR প্রকল্পটি ছিল একটি কৃষক সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে যারা সংগঠিত হয়ে দেশটির সামাজিক বিনির্মাণে নিজেদের ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিল। প্রাথমিক অনুসন্ধান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একজন শিক্ষাবিদ ম্যালেনা দ্য মন্তিস-এর সমন্বয়ে একটি গবেষক দল গঠন করা হয়। National Programme of Adult Education এর কিছু সমন্বয়কারী এবং জনগণের বিভিন্ন সংস্থা এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধিরা এই দলের সদস্য ছিলেন। গবেষক দলটি সম্প্রদায়টির ইতিহাস এবং *এল রিগাদিও'র* তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধানের একটি খসড়া প্রস্তুত করে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, শিক্ষাগত, অভিবাসিক, উৎপাদন সম্পর্কযুক্ত, জমি সংক্রান্ত, সাংগঠনিক এবং সমাজদর্শনগত বৈশিষ্ট্য। এই খসড়াটি একটি বৃহত্তর কমিটির কাছে পেশ করা হয় যারা এটির পরিবর্ধন এবং পরিবর্তন সাধন করেন। কয়েকটি কর্মশালায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সদস্যদের জরিপ কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ চালানোর সময় তারা পরিবারের সদস্যদের কাছে এই আন্দোলনের অংশগ্রহণমূলক চরিত্রটি ব্যাখ্যা করেন এবং জানান যে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যগুলো তাদের কাছে ফেরত নিয়ে আসা হবে তারা যাতে এগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

জরিপ শেষ হবার পর প্রাপ্ত তথ্যগুলি সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ট্যাবুলেশন করা হয়। তারপর তথ্যগুলি বিভিন্ন বোর্ডে সাজিয়ে সম্প্রদায়ের সব সদস্যদের একটি সম্মেলনে আহ্বান করে তাদের সামনে পেশ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের উপর গভীরভাবে আলোচনা করেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং মিউনিসিপ্যালিটি পর্যায়ের বিভিন্ন জনসংস্থার প্রতিনিধিদের একটি সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সম্মিলিতভাবে সব সংস্থাদের প্রকল্পের সমন্বয় সাধন এবং যুক্তভাবে বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান অনুসন্ধান। এই সমন্বয় কমিটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান বিতরণ পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং অডিও ভিস্যুয়াল তথ্যায়নের ব্যবস্থাও করেন। পুস্তিকাটির নাম ছিল **"জনগণের নিজস্ব গবেষণার প্রতিবেদন"**। এটি প্রকাশের জন্য একটি বয়স্ক শিক্ষা ম্যাগাজিনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা কাঠের

অনুলেখনযন্ত্র (mimeograph) থেকে অনুলিপি প্রস্তুত করা শেখে, তথ্য উপস্থাপনের জন্য চিত্রলেখসহ অন্যান্য পদ্ধতি আয়ত্ত করে এবং তাদের লিখন ক্ষমতার উন্নতি ঘটায়, যদিও সম্পূর্ণ বাক্য লেখার চেয়ে অর্থ বোঝানোর ব্যাপারটিকেই তারা বেশী গুরুত্ব দেয় ।

একটি 'সমাজতান্ত্রিক' দেশে সম্ভবত এটাই প্রথম জনগণের গবেষণা । বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই গবেষণার একটি উপসংহারে বলা হয় যে এটিই জনগণের জন্য প্রকৃত "সাক্ষরতা" - বৈপ্লবিক নিকারাগুয়ার বহু বিজ্ঞাপিত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের সমালোচনা করে বলা হয় যে এই প্রকল্পে জনগণকে শেখানো হচ্ছে ।[৭]

১০. PAR এর বৈধতাকরণ

PAR এর বৈধতাকরণের প্রশ্নটি এখনও পর্যন্ত কর্ম গবেষকদের ব্যাপৃত রেখেছে (Reason & Bradbury, 2001 সূচনা এবং উপসংহার দ্রষ্টব্য) । ভূমিসেনা এবং PORP এর পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্পর্কে আমার ধারণা হয় যে বৈধতাকরণ নির্ভর করে **সম্মিলিত ঐক্যমত/যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত/ যথার্থতা যাচাইকরণের মধ্যে, যা একক ব্যক্তির নিজস্ব মনোগত (subjective) চিন্তাভাবনা ও লব্ধ জ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ (objectiove) করে তুলতে পারে, এবং যে কোন স্বীকৃত অনুন্ধান-ধারার ('school of inquiry') মানদন্ডে উত্তীর্ণ অনুসন্ধানের মতোই সাধারণ মানুষের অনুসন্ধান, যা তাদের সম্মিলিতভাবে নির্ধারিত বৈধতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ, সমান বস্তুনিষ্ঠতা এবং বৈজ্ঞানিক চরিত্রের দাবিদার ।**

১৯৮২ সালে World Congress of Sociology তে আমি একটি পেপার পেশ করে তাতে বলি যে সব গবেষণাতেই subjective bias রয়েছে । সেখানে আমি বলেছিলাম,- "যে কোন মানবিক ঘটনার ধারণায়ন (conceptualization) এবং প্রণালীকরণ (categorization) প্রক্রিয়াতেই subjective bias থাকে, এবং এই ধারণা ও প্রণালী সম্পূর্ণভাবে পরস্পরকে বোঝাবার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাষা ও সংজ্ঞার সাথে সাথে ইন্দ্রিয় (sensuous) পর্যায়ে আদান প্রদানও সমানভাবে প্রয়োজন । তবে আর এক অর্থে একটি গবেষণাকে বস্তুনিষ্ঠ (objective), 'বৈজ্ঞানিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, সেটি হল যদি গবেষণাটির কর্মপদ্ধতি এবং ফলাফল সামাজিক বিচারের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয় । এইভাবে একটি সামাজিক জ্ঞানের সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তির জ্ঞান তথা আত্মগত (subjective) জ্ঞান থেকে ভিন্ন । এরকম অর্থে বস্তুনিষ্ঠতার জন্য ব্যক্তির গন্ডি থেকে যৌথতার গন্ডীতে উত্তরণ প্রয়োজন । আর তার জন্যে প্রয়োজন-

৭. অরল্যান্ডো ফালস্ বোর্দার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ILO'র PORP প্রোগ্রামের অধীনে নিকারাগুয়া ছাড়াও মেক্সিকো এবং কলম্বোতে আরো দুটি PAR প্রকল্প নেওয়া হয় । ফালস্ বোর্দা প্রকল্প তিনটির একটি সংশ্লেষণ করেন, যেখানে তিনি তথ্য সংগ্রহ এবং তার বৈধতাকরণ, গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস পুনরুদ্ধার, গণ-সংস্কৃতির মূল্যায়ন এবং ব্যবহার, নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি এবং বিতরণ সম্পর্কে পদ্ধতিগত নির্দেশাবলী প্রদান করেন । (ফালস্ বোর্দা, ১৯৮৫)

ক) একটি যৌথ ব্যক্তিত্ব (collective) গঠন;

খ) যৌথ ব্যক্তিত্বটির সদস্যদের মধ্যে আদান প্রদানের জন্য একটি ভাষা;

গ) যৌথ ব্যক্তিত্বটির সদস্যদের মধ্যে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যুক্তির সংস্কৃতি এবং বিতর্ক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ঐকমত্য ।

"যেকোন স্বীকৃত গবেষণা-ধারার কাজেই স্পষ্ট বা উহ্যভাবে বৈধতার উপরোক্ত মানদন্ডটি বিদ্যমান এবং যদি তাদের নিজস্ব প্যারাডাইমের সংস্কৃতির মানদন্ডে বিচার করা হয়ে থাকে তাহলে এই গবেষণাগুলি বস্তুনিষ্ঠতার দাবী রাখে। যে সব অনুসন্ধান-ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এই বৈধতার মানদন্ডটি কম বেশী স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড হয়ে গেছে এবং তাই বর্তমানে কিছু স্বীকৃত নিয়ম কানুন প্রয়োগের মাধ্যমেই বৈধতা নির্ণয় করা সম্ভব, এর জন্য মানুষ-মানুষের মধ্যে আদান প্রদান আর আবশ্যিক নয় । তবে একথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে এই বস্তুনিষ্ঠতা আসলে আপেক্ষিক, এবং অনুসন্ধান-ধারার যৌথ ব্যক্তিত্বের পরিমন্ডলের মধ্যেই (যথা, পেশাদার গবেষকমন্ডলী) এই বস্তুনিষ্ঠতার দাবী টেঁকে। আর তাই যারা যোগাযোগের সীমাদ্ধতার কারণে অথবা বৈধতার নিয়মকানুন সম্বন্ধে দ্বিমতের কারণে এই ধারার বা যৌথ ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত নন, তাদের কাছে এই জ্ঞান হয় অর্থহীন অথবা অগ্রহণযোগ্য। এই অর্থে কোন 'বিজ্ঞানই' সার্বজনীনতার দাবী করতে পারে না, যেহেতু সম্পূর্ণ মানবজাতি জ্ঞানার্জনের জন্য একই যৌথ ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় চাইনিজ আকুপাংচার পাশ্চাত্তের বৈধতার মানদন্ডের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, তাই চীনের নিজস্ব চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈধ্যতার মানদন্ডে এটি 'অবৈজ্ঞানিক' জ্ঞান নয়।" (রহমান ১৯৮২; ৯০-৯১)

১১. "মাফ করবেন স্যার, কিন্তু আপনি একটি লেকচার দিয়ে ফেলেছেন।"

যখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি একজন উজ্জীবকের ভূমিকা (অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য) সম্পর্কে মোটামুটি সম্যক ধারণা লাভ করেছি ঠিক সে সময়ে আমার এমন একটি অভিজ্ঞতা হয় যার ফলে আমি এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় শিক্ষা লাভ করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে উজ্জীবক হিসেবে আমার নিজের একটি প্রধান দুর্বলতার সঙ্গে পরিচিত হই। এই অভিজ্ঞতাটি হয় ১৯৮৮ সালে, ফিলিপাইনের তাগায়তাইতে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায়। "Promoting Participation & Self-reliance" ছিল PORP আয়োজিত এই কর্মশালার বিষয়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশের সতেরোটি NGO-র নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আমি এবং তিলকারত্ন ছিলাম প্রধান সঞ্চালক (facilitator)। আমি অংশগ্রহণকারীদের বলি যে এখানে কোন লেকচার দেওয়া হবে না, তারা যেন তাদের তৃণমূল পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা প্রশ্নগুলো বোর্ডে লেখে, যা থেকে তারাই দশ দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রশ্নগুলো আলোচনার জন্য এজেন্ডা তৈরী করবে এবং প্রতি সেশনে তাদের ভিতর থেকেই

দুইজন আলোচনার সূত্রপাত করবেন। অংশগ্রহণকারীরা এতে খুবই উদ্দীপ্ত হন এবং এর ফলে কর্মশালাটি হয়ে ওঠে সম্মিলিত আত্ম-অনুসন্ধানের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এক পর্যায়ে একটি প্রশ্নের সমাধান খোঁজা তাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে পড়ছে দেখে আমিই তাদের বেশ কিছুক্ষণ ধরে এ ব্যাপারে আমার বিশ্লেষণ দিই।

আমি শেষ করার পর হলের পেছন থেকে এক থাই অংশগ্রহণকারী হাত তুলে নরম গলায় বলেন, *"মাফ করবেন স্যার, আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আপনি একটা লেকচার দিয়ে ফেলেছেন!"*

আমি বুঝতে পারলাম কি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিলো বলে আমার সাথে একটা ছাতা ছিল। আমি ছাতা হাতে হলের পিছনে সেই বক্তার কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম "আমি স্লিপ করেছি, এটা দিয়ে তুমি আমায় মারো"।

কিছুদিন পর ফিলিপাইনের সারিলাকাস প্রকল্পের একজন প্রধান উজ্জীবক এডেল গুইজা আমাকে তাঁর কাজ সম্পর্কে লেখেন-

"এই কাজে সবসময় আমাদের শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, আর সবচেয়ে বড় শত্রু লুকিয়ে কাছে আমার নিজেরই ভিতরে"!

১২. *"আমরা দরিদ্র নই একথা বলার জন্য ধন্যবাদ"*

নিম্ন আয়ের মানুষদের 'দরিদ্র' হিসাবে আখ্যায়িত করা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, যেন এটিই তাদের প্রধান পরিচয়। তাদেরকে চরিত্রায়িত করে তোলার এই নামকরণের সংস্কৃতি নিজেই তাদেরকে একটি নেতিবাচক আত্মপরিচয় দেয় যা তাদের সমাজে নিজেদের জাহির করবার এবং নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগ নেবার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এই সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা না করে আমি নিজেও এই নামকরণ সংস্কৃতি বহু বছর ধরে অনুসরণ করেছি, এমনকি আজও আমাকে অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে কথোপকথনে এই ভাষা ব্যবহার করতে হয় কারণ এই ভাষাতেই তারা অভ্যস্ত। নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে অনেকে নিজেরাও এটিকে তাদের প্রধান পরিচয় হিসেবে আত্মস্থ করেছে এবং অপেক্ষা করে আছে কখন বিত্তশালীরা উদ্যোগ নেবে তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে।

কিন্তু এমন যথেষ্ট প্রমাণ আছে (যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে দেবার প্রয়োজন নেই) যে, যাদের আমরা দরিদ্র বলি তাদের অনেকেই এই বৈশিষ্ট্যকরণকে পছন্দ করেন না, এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধে কথা বলেন। আমি এই প্রশ্নে আমার একটি গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পেশ করছি।

আমি জিম্বাবুয়ের মাতাবেলেল্যান্ড-এ একটি সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। সেখানে প্রায় ৫০০টি গ্রাম হতে আগত মানুষ ছিল যারা "ওরাপ" (ORAP: অর্গানাইজেশন অফ রুরাল

এ্যসোসিয়েশনস্ ফর প্রগ্রেস) নামে একটি সংগঠনের আওতায় নিজেদের সংহত করে একটি অনন্য সাধারণ যৌথ উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল (নিওনি ১৯৯১)। আমি তখন 'দরিদ্র' এবং 'দারিদ্র্য' কথাগুলো ব্যবহার প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকিত হয়েছিলাম। ওরাপ কর্তৃপক্ষ আমাকে *'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র'* মোকাবেলায় গণউদ্যোগের ভূমিকা নিয়ে কিছু বলার আমন্ত্রণ জানান। আমি আমার বক্তৃতায় তাদের দেয়া শিরোনাম নিয়েই আলোচনা করি। বিপুল সমাবেশের কাছে আমি প্রশ্ন করি কেন তারা নিজেদের দরিদ্র বলে, এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে উত্তরণকেই কেন তাদের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করছে যখন তাদের অসাধারণ আত্ম-উন্নয়নমূলক কাজ পুরো বিশ্ব মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে এবং যখন মানুষেরা দূর-দূরান্ত থেকে তাদের কাছে আসছে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেখে তার থেকে শেখার জন্য। কি প্রচুর ধন তাদের রয়েছে যে, তারা পুরো বিশ্বকে এভাবে শেখাচ্ছে! আমি তাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষদের কথা মনে করতে বল্লাম যারা গুহায় থাকতো, নিজেদের নগ্নতা ঢাকবার জন্য যাদের প্রায় কিছুই ছিলনা—কেউ তো তাদেরকে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করে না বরং তারাই আজ আমরা যেখানে আছি সেই মানব সভ্যতার নির্মাণে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছে। তাদের জীবন ছিল মানবজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শুরু, এবং একইভাবে জিম্বাবুইয়ের বর্তমান জনগণই সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত এই জাতিটির অগ্রযাত্রার সূচনা করবে। এরকম সময়ে কেন তারা আন্দোলনটিকে পিছনে টেনে রাখবে, সীমিত করবে এই ধরনের নেতিবাচক আত্মপরিচয় এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে?

আমি যখন মঞ্চ থেকে নামলাম তখন প্রায় শ'খানেক গ্রামবাসী, ছাত্র-ছাত্রী এনজিও কর্মী ও আরও অনেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলো এবং বললো যে, *"আপনি আমাদের প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছেন কিন্তু আমরা এটি এপ্রিশিয়েট করেছি।"* কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এলো যখন রাতের খাবার শেষে আমি আমার তাঁবুর বাইরে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে হাঁটতে বের হলাম।

পেছন থেকে একটি ভারী স্বর আমাকে ডাকলো: *"মি: রহমান, আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি?"*

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম একজন লম্বা তাগড়া মানুষকে যিনি ওরাপের আন্দোলনের সাথে যুক্ত একজন কামার হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেন। এই আন্দোলনে তারা কি কি করছেন তা খুব গর্বের সাথে বললেন এবং একসময় তার বিশাল থাবা দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন-

"মি: রহমান, আমরা দরিদ্র নই এই কথা আমাদের বলার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

তিনি ওরাপ আন্দোলন সম্পর্কিত বক্তব্যে ফিরে গেলেন এবং আরও দুইবার আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন-

"ওহ, মি: রহমান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা দরিদ্র নই এটি বলার জন্য ।"

আমার মনে হল, আমি তার ঘাড় থেকে একটি বড় বোঝা সরিয়ে নিয়েছি এবং তিনি এখন মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পারছেন । এটি আমার জন্য ছিল এমন একটি পুরস্কার যা আমি কোন কিছুর সঙ্গেই বিনিময় করতে রাজী নই ।

এর থেকে PAR সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল: **PAR-এর একটা দায়িত্ব মানুষের ইতিবাচক গুণাবলী তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধির চেষ্ট করা । তাদের 'দরিদ্র' হিসেবে অবমূল্যায়ন না করে তাদের চ্যালেঞ্জ দেয়া যে তারাও পৃথিবীকে চমকে দিতে পারে । দারিদ্র্য একটি পরিস্থিতি মাত্র যেখানে তারা অবস্থিত, কিন্তু তাই বলে সেই বিশেষ মানুষগুলো কারো থেকে ছোট নাও হতে পারে, এবং আমরা তাকে যে নামে ডাকবো তাতে এই স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক ।**

১৩. "পরস্পরকে নির্মাণ ও শাণিত করা"

আমি PAR এর উপর আমার স্নাতক পর্যায়ের চূড়ান্ত শিক্ষা পাই ১৯৯০-এ যখন জিম্বাবুইয়ের মাতাবেলেল্যান্ড-এ ওরাপ আয়োজিত তৃণমূল উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর একটি প্যান আফ্রিকান কর্মশালাতে গিয়েছিলাম । সেখানে আমি তাদের 'প্রশিক্ষণ' প্রত্যয়টি প্রত্যাখ্যান করি । বলি যে, আমরা একটি বানরকে ডুগডুগির বাজনা অনুযায়ী নাচতে প্রশিক্ষণ দিতে পারি, কিন্তু মানুষকে কেমন করে মাঠ চরিত্রের গতিময়তার সৃষ্টিশীল প্রত্যুত্তর দিতে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়? আমি আমার আফ্রিকান কলিগদের আহ্বান করি তাদের জনগণের নিজস্ব ভাষায় এমন কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে যা আমরা যা চাচ্ছি তাকে প্রকাশ করে । অনেক খোঁজাখুঁজির পর বান্টু ভাষায় দুটো শব্দ পাওয়া গেলো (uakana যার অর্থ "পরস্পরকে নির্মাণ করা" এবং uglolana যার অর্থ "পরস্পরকে শাণিত করা" । গণ আত্ম উন্নয়ন (PSD) প্রত্যয়টি প্রকাশের জন্য সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে পাওয়া এই দুটি শক্তিশালী শব্দ সম্বন্ধে আমি যে কতবার লিখেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আলোচনায় বলেছি তার ইয়ত্তা নেই (যেমন, রহমান ১৯৯৪ খ: ২২২) । জনগণের মধ্যে এবং জনগণের সাথে যে সম্পর্কটি পুন:সৃষ্টি এবং বিকশিত করবার চ্যালেঞ্জ PAR-এর কাছে এসেছে, এই শব্দ দুটি সেই ধারণাটিই ধারণ করে, যে ধারণাকে বহিঃকর্তৃত্ব মুছে দিয়ে চালু করেছে অধিকারতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক এবং কর্তৃত্ব-নির্ভর শব্দ "প্রশিক্ষণ" ।

এখন আমি বুঝি যে, জীবনের পাঠশালার স্নাতকোত্তীর্ণ হওয়া আসলে জীবন ও তার বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সূচনা মাত্র । অর্থাৎ সারাজীবনই জীবনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই শেখা এগুতে থাকবে, এবং হয়তো জীবনও শিষ্যের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসায় সমৃদ্ধতর হবে । আর আমার কাছে এটাই PAR ।

১৪. উপসংহার

আমার দৃষ্টিতে গণআত্মউন্নয়নকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই PAR এর লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য PAR সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করে, তাদের জীবনের অবস্থার প্রেক্ষিতে যৌথ অনুসন্ধান উজ্জীবিত করে এবং তাদের উন্নততর জীবনের সন্ধানে যৌথ উদ্যোগে প্ররোচিত করে। PAR এর একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য মনস্তাত্ত্বিক। PAR মানুষের মানবিক আত্ম-শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে, বাইরের উপদেশ/নির্দেশনা/ সহায়তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি দেয় এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে আন্দোলিত করে তাদের চিন্তা ও কর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বের করে আনে। আমি অবশ্য শুধু সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী নয় বরং সমগ্র মানবতার প্রতি PAR এর দায়িত্ব দেখি, আর তাই আমি দেখতে চাই PAR বঞ্চিত জনগণকেও তাদের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ দেখাতে চ্যালেঞ্জ করে যাবে। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে যে মানুষকে যদি, এমনকি কঠিন ভাষাতেও চ্যালেঞ্জ করা হয় এই বিশ্বাস নিয়ে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ মানুষ রয়েছে, এবং এই বিশ্বাস নিয়ে তাকে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেখাতে আহবান করা হয়, তাহলে মানুষ ইতিবাচকভাবেই সাড়া দেয়।

আর এই জন্যেই PAR এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল উজ্জীবনা প্রদান[৮] প্রয়োজন, এবং এক্ষেত্রে উজ্জীবকের নিজের মধ্যে লুকানো বা প্রকাশ্য কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতা সম্বন্ধে সদাসতর্ক থাকা প্রয়োজন। হয়তো উজ্জীবক কখনই একবারে ত্রুটিমুক্ত হতে পারবেন না, হয়তো ভুল করবেন, কিন্তু নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং নিজের ত্রুটিসহ লব্ধ অভিজ্ঞতার আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে তাদের পক্ষে উন্নতি করে যাওয়া সম্ভব।

PAR সম্পর্কে এবং বিশেষ করে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা অথবা কর্ম গবেষণা সম্পর্কে অন্যান্য ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভাবিত নানা ধারণা বিদ্যমান। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটি একটি সচেতন বা অবচেতন ভাবাদর্শের প্রশ্ন, যে ভাবাদর্শ একদিকে মতবিনিময় এবং বিতর্কের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে পারে, আর অন্যদিকে দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতিতে পারস্পরিক আদান প্রদানে ঋদ্ধ হতে পারে।

সবশেষে, একটি প্রশ্ন থেকে যায় বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনে (macro social change) PAR এর অবদান কী হতে পারে- যথা, macro scale-এ গণআত্ম-উন্নয়নের বিকাশে এবং সামাজিক সম্পদের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমাজে সমতা আনতে PAR কী ভূমিকা রাখতে পারে। PAR-এর পক্ষে কোন সামাজিক আন্দোলন হয়ে উঠা সম্ভব কিনা বা এরকম কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব কিনা তা এখনো বলা যাচ্ছে না। কিন্তু

৮. এখানে উজ্জীবনা প্রদান শব্দটির মধ্যে facilitation এর ধারণাটিও অন্তর্ভুক্ত (পাদটীকা ৬ দেখুন)।

PAR-এর মাধ্যমে সৃষ্ট উচ্চ সচেতনতা সম্পন্ন এবং সৃজনশীল আত্মউন্নয়ন ক্ষমতায় পরিপুষ্ট স্থানীয় পর্যায়ের গণআন্দোলন বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব হতে পারে। PAR বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের ভাবাদর্শগত দর্শনকেও উন্নততর করতে আবদান রাখতে পারে (রহমান, ২০০৪)। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নীত সচেতনতা এবং সৃজনশীল, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত গণ-আত্মউন্নয়নের অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন সামাজিক পরিবর্তন প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক সমতা এনে দিলেও পরবর্তীতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন চেহারায় বিভাজন ও কর্তৃত্বপরায়ণতার সৃষ্টি করে আবারও সামাজিক অসমতা এনে দিতে পারে। এই ধরনের প্রবণতার পূর্ণ সমাধান হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না কিন্তু PAR এক্ষেত্রে 'শুভ' শক্তিকে বলবান করতে পারে, আর সমাজে যদি কোনদিন সমতা আনা যায় তাহলে তার স্থায়ীত্বের পক্ষে শক্তি বাড়াতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

Das Gupta, Subhachari (1986) *Forest, Ecology and the Oppressed (A Study from the Viewpoint or the Forest Dwellers)*, New Delhi: People's Institute for Development and Training.

de Montis, Malena (1987): *PARticipatory Research in Nicaragua, Report on a Pilot Project* . Abridged English version prePARed by Md. Anisur Rahman (mimeo; electronic copy available from Rahman or from RIB upon request).

de Silva, G.V.S., Niranjan Mehta, Ponna Wignaraja, Md. Anisur Rahman (1979) "Bhoomi Sena: a struggle for People's Power", *Development Dialogue,* No. 2, 3-70.

Fals Borda, Orlando (1985). *Knowledge and People's Power, Lessons with Peasants in Nicaragua, Mexico and Colombia.* New Delhi: Indian Social Institute.

Fals Borda, Orlando (2001). "PARticipatory (Action) Research in Social Theory: Origins and Challenges". Reason and Bradbury (2001).

Nyoni, Sithembiso (1991). "People's Power in Zimbabwe".Fals Borda and Md. Anisur Rahman, *Action and Knowledge, Breaking the Monopoly with PARticipatory Action Research,* London: Intermediate Technology Publications.

PARanjape, P.V. *et al* (1984). "Grass-roots Self-reliance in Shramik Sanghatana, Dhulia District, India" in Rahman (1984)

Rahman, Md. Anisur (1981) (Guest editor). *Development, Seeds of Change, Village through Global Order*. Issue 1. Rome:Society for International Development.

Rahman (1984). *Grassroots PARticipation and Self-reliance, Experiences in South and South-east Asia*, New Delhi, Oxford and IBH.

Rahman, Md. Anisur (1994): "People's Self-development", *People's Self-Development, Perspectives in PARticipatory Action Research, A Journey through Experience*, Zed Books, London,and University Press Limited, Dhaka. Also published in Fals Borda, Orlando (ed) (1985), The Challenge of Social Change, London, Sage Publication; and Shadish, William R Jr and Reichart, Charles S. (eds) (1987), *Evaluation Studies Review Annual*, Vol. 12, London, Sage Publication

Rahman (1994a): 'SARILAKAS means strength: initiating people's organizations in Philippine *Barangays'*, in Rahman (1994).

Rahman, Md. Anisur (1994b): "The Theory and Practice of PARticipatory Action Research", in Rahman (1994).

(1994c): "The Praxis of PORP: A Programme in PARticipatory Rural Developoment", in Rahman (1994).

Rahman, Md. Anisur (1994d): "People's self-development", in Rahman (1994)

Rahman, Md. Anisur (1994e): "Towards an Alternative Development PARadigm", in Rahman (1994).

Rahman, Md. Anisur (1997) (ed.) *Je Agun Jolechhilo, Muktzjuddher Chetonar Shwatosphurto Prakash* (The Fire that lit: spontaneous expressions of the Awareness of the Liberations War), Dhaka: Gonoprokashoni.

Rahman, Md. Anisur (2000) (ed.). *PARticipation of the Rural Poor in Development*. Dhaka Pathak Shamabesh. Reproduced in Rahman (1981).

Rahman, Md. Anisur (2003): *Roots of PARticipation and Self- reliance Thinking and Action Research in Rabindranath Tagore.* Paper presented at the ALARPM 6th & PAR 10th World Congress, September 21-24, 2003, at the University of Pretoria, South Africa.

Rahman, Md. Anisur (2004, in press): "Globalization, the Emerging Ideological Struggle and Grassroots Action Research" *Action Research* (2.1). Sage Publication.

Reason, Peter, and Hilary Bradbury (Eds.).(2001). *Handbook of Action Research: PARticipative Inquiry and Practice.* London: Sage Publications.

Tilakaratna, Susanta (1984) 'Grassroots Self-reliance in Sri Lanka: organizations of betel and coir yarn producers', in Rahman (1984).

Tilakaratna, Susanta (1985). *The Animator in PARticipatory Rural Development: Some Experiences in Sri Lanka.* World Employment Programme Working Paper WEP 1O/WP 37, Geneva: ILO.

Tilakaratna, Susanta (1987). *The Animator in PARticipatory Rural Development (Concept and Practice).* Geneva, International Labour Organization.

Women's Research Committee et al.(1984). "The Struggle Toward self-reliance of organized resettled Women in the Philippines", in Rahman (1984)

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর উদ্যোগে ২৭-২৯ মার্চ, ২০০৪ ঢাকায় আয়োজিত গণগবেষণা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপের কী নোট পেপার হিসাবে লিখিত। বাংলা অনুবাদের খসড়া করে দেবার জন্য লেখক সুরাইয়া বেগম - এর কাছে কৃতজ্ঞ।

তথ্য অধিকার
আইনের সহজপাঠ

প্রথম অধ্যায়
তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ দেশের সবচেয়ে যুগান্তকারী একটি আইন। নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যত নতুন আইন তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে এই আইনটিই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর একটি হাতিয়ার বলে অনেকে মনে করেন। তাই আইনটির স্বরূপ ও এর প্রয়োগ-প্রণালী সম্পর্কে সকল স্তরের মানুষের পরিষ্কার ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষরা যাতে এ আইনটি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারে ও নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তাই এই আইনটি তাদের খুব ভালোভাবে জানা দরকার। তাছাড়া এর মাধ্যমে তারা সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণকে আইনটি সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্যেই এই বইটি লেখা হয়েছে। তারা যাতে বুঝতে পারে যে, কোন দোকানদার বা ফেরীওয়ালার কাছ থেকে তারা যেমন তাদের টাকার হিসেব চাইতে পারে, সরকারের কাছ থেকেও তেমনি তার কাজের হিসেব চাইতে পারে। সরকারের কাছ থেকে এই হিসেব চাওয়া ও পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকারকে এখন আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের অফিস থেকে শুরু করে মাননীয় রাষ্ট্রপতির অফিস পর্যন্ত সর্বস্তরের সরকারী অফিস থেকেই জনগণ নানাবিধ তথ্য এখন আইনত: চাইতে ও পেতে পারে, যা আগে ভাবাই যেতনা। *

২. তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন ?

তথ্য অধিকার আইনটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়ে ২০০৯ সনের ০১ জুলাই থেকে সরকারীভাবে সারা বাংলাদেশে কার্যকর হয়েছে। এই আইনটি যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় সেজন্য কিছু বিধিমালাও প্রণীত হয়েছে পরবর্তী সময়ে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এখন আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে পারে কেবলমাত্র জনগণই। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরাই এই আইনটি ব্যবহার করতে পারবেন। তাই এই লেখায় জনগণ বলতে শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের বোঝানো হয়েছে।

---

* এই বইটি পড়ার সময় "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯"-এর মূল ধারা এবং সেই সঙ্গে বিধিমালাসমূহও দেখে নেয়া ভালো।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকার এবং সেইসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) - যারা সরকারী বা বিদেশী পয়সায় পরিচালিত - তাদের কাছ থেকে তাদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কিত এমন সব তথ্য চাইতে পারে যা তারা আগে জনগণকে দিতে বাধ্য ছিল না বরং তাদের কাছ থেকে গোপন রাখত। এখন তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সেসব তথ্য জনগণের জানার অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে। তাই মনে রাখতে হবে, সরকারী কাজ সংক্রান্ত যেসব তথ্য সরকার আগে জনগণকে দিতে বাধ্য ছিল না, আর যা সরকার সাধারণত: প্রকাশ করত না, এখন এই আইনের মাধ্যমে সেসব তথ্য জনগণকে দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা আনা এবং সরকারকে জনগণের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক রাখাও আইনটির একটি মূল লক্ষ্য।

৩. সরকার কি ধরনের তথ্য জনগণের কাছ থেকে সাধারণত গোপন রাখতে চায় এবং কেন?

সহজ কথায় বলা যায়, যেসব তথ্য সরকারী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ সরকার কিভাবে কাজ করে ও সিদ্ধান্ত নেয়, কি প্রক্রিয়ায় বা কোন তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, সেসব তথ্য সরকার সাধারণতঃ জনগণকে দিতে চায়না। অনেকে এসবকে সরকারের ভেতরের খবর বলে অভিহিত করে থাকেন। এসব তথ্য জনগণ জানলে তারা সরকারী কর্মকান্ডের অন্দরমহলের যাবতীয় খবর (তথ্য) জেনে যাবে এবং তার ফলে সরকারী কাজে কোন অস্বচ্ছতা, অনিয়ম বা দুর্নীতি থাকলে তা ফাঁস হয়ে যাবে এবং তাতে সরকারের ও সরকারী কর্মকর্তাদের হয়রানী হবে এবং জনগণের কাছে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তাই এসব তথ্য সরকার সাধারণতঃ জনগণের কাছে গোপন রাখতে চায়। বিদেশী শাসকদের আমলে সরকার যখন জনগণের 'প্রভু' ছিল, তখন তাদের এই তথ্য গোপন করার নীতি জনসাধারণ মেনে নিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে প্রকৃত অর্থে সব ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং সরকার জনগণের 'সেবক' (অনেকে বলেন 'ভৃত্য') মাত্র। জনগণের অর্থেই সরকার পরিচালিত হয়। তাই সরকারী যাবতীয় কর্মকান্ডের তথ্য জনগণের জানার অধিকার আছে। এইসব তথ্য জানলে জনগণ সরকারের ওপর নজরদারি করতে পারে ও তার মাধ্যমে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। ফলে তারা নিজেদের অধিকার ও সুশাসন আদায় করতে পারে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করতে পারে। তাই আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারী তথ্য জনগণকে দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে।

৪. 'তথ্য' বলতে কী বোঝায় ?

তথ্য অধিকার আইনের **২(চ) নম্বর ধারায়** 'তথ্য' বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'তথ্য' মানে সরকারী এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থে পরিচালিত বেসরকারী (এনজিও) সব প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী, ব্যবস্থাপনা কাঠামো,

অফিসের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাগজপত্র, ফাইল, বই, নকশা, উপকরণ, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, রিপোর্ট, খরচের হিসেব, প্রকল্প প্রস্তাব, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সব কিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সরকার যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি ক'রে সিদ্ধান্ত নেয় তার লিখিত বিবরণ এবং সরকারী কাজে যেসব দলিলপত্র ব্যবহার হয়, সরকারী কাজের মাধ্যমে যেসব দলিল, চিঠি, ফাইল ইত্যাদি তৈরী হয়, তা সবই তথ্য। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ধারণকৃত সবকিছুই তথ্য। আর এও দেখা যাচ্ছে যে, তথ্য অধিকার আইনের দৃষ্টিতে **'তথ্য'** ও সাধারণ অর্থে **'তথ্য'**র অর্থ এক নয়। আমরা সাধারণ অর্থে 'তথ্য' বলতে সবরকম প্রকাশিত খবর, সংবাদ, সমাচার, বিবরণ, বৃত্তান্ত, প্রতিবেদন, দলিল, বই ইত্যাদি বুঝে থাকি। আরো বিশদভাবে বলা যায়, আমরা দৈনিক নানান ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করি। যেমন, ব্যক্তিগত তথ্য, পারিবারিক তথ্য, সাংসারিক তথ্য, দেশ-বিদেশের তথ্য, বইয়ের তথ্য ইত্যাদি। আর তথ্য অধিকার আইনের অর্থে 'তথ্য' হচ্ছে সরকারের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অপ্রকাশিত এবং গোপনীয় সব তথ্যাদি। এখানে অপ্রকাশিত এবং গোপনীয় শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকাশিত সরকারী অনেক তথ্য আছে যা এই আইন প্রয়োগ করে জানার দরকার হয় না। কারণ, তা সরকারের বিভিন্ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য। তবে তথ্য অধিকার আইনে সরকারের এই রকম প্রকাশিত তথ্য চেয়ে আবেদন করার ক্ষেত্রেও কোন বিধি-নিষেধ নেই।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পড়ে এরকম তথ্যের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার গ্রামের রাস্তা কবে তৈরী বা মেরামত হবে এবং যে ঠিকাদারের মাধ্যমে তা করা হবে তার কাজের চুক্তিপত্র এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ও ফাইলপত্র হচ্ছে তথ্য; আপনার বাড়িতে কবে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে সেই সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের নথিপত্র হচ্ছে তথ্য; সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি কি ওষুধ বিনামূল্যে দেবার কথা সে সম্বন্ধে সরকারী নির্দেশ একটি তথ্য; সরকারী স্কুলে শিক্ষক আসেন না কেন সে ব্যাপারে স্কুল-কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা তথ্য; বয়স্কভাতা বা ভিজিএফ কার্ড প্রদানের ব্যাপারে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ও কারা তালিকা তৈরী করেছে তা-ও তথ্য। এসব তথ্য জনগণের কাছে কত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫. তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য কী ?

তথ্য অধিকার আইনের গোড়াতেই বলা হয়েছে : "জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক"। তাই বলা যায় যে, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতা স্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও সততা আনা, সরকারের এবং সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সরকারী কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ

করা এবং দেশে সত্যিকার অর্থে সুশাসন ও গণতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হ'তে পারে। যেসব দেশের নাগরিকরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ব্যাপারে যত বেশি সচেতন এবং দায়িত্বশীল, সেইসব দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন তত বেশী শক্তিশালী হয়, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্ববান হয়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারী কাজ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং দেশের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একই সঙ্গে নিজেদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

৬. কোন্ অফিস থেকে তথ্য পাওয়া যাবে ? 'কর্তৃপক্ষ' বলতে কী বোঝায় ?

তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে যে, এই আইনের বলে জনগণ সব রকম সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী বা বিদেশী পয়সায় পরিচালিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসমূহের কাছ থেকে ওপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য এখন আইনতঃ চাইতে পারবে। আর কর্তৃপক্ষ বলতে কি বোঝায় তার সংজ্ঞা আইনের **২(খ) ধারায়** দেয়া হয়েছে। মোটা দাগে বলা যায় যে, যেসব সংস্থা জনগণের (পাবলিক) বা বিদেশী পয়সায় পরিচালিত হয় সেইসব সংস্থা এই আইনে 'কর্তৃপক্ষ' সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। তথ্য অধিকার আইনে এইসব কর্তৃপক্ষকে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। আইনের **৪ নং ধারাতে** বলা হয়েছে, দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এসব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পাবার অধিকারী এবং প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক নাগরিককে বিশেষ কিছু তথ্য ছাড়া (এ ব্যাপারে ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বলা হয়েছে) অন্য সব তথ্য প্রদানে বাধ্য। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার কর্তৃপক্ষ অথবা উপরিল্লিখিত এনজিওসমূহ বাদে অন্য যেসব এনজিও নিজেদের অর্থায়নে পরিচালিত হয় তারা এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যক্ষভাবে আইনের আওতায় না পড়লেও পরোক্ষভাবে এসব সংস্থা এ আইনের আওতায় পড়তে পারে।

৭. কার কাছে তথ্য পাবার জন্য আবেদন করতে হবে ? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাকে বলে ?

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারী কর্তৃপক্ষ ও আইনের আওতাভুক্ত বেসরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের অফিসে একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে যার কাছে জনগণ তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবে। এইসব কর্মকর্তাকে **"দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** নাম দেয়া হয়েছে। **আইনের ১০ ধারা** অনুযায়ী, এই আইন কার্যকর হবার ৬০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে উপরোল্লিখিত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। **১০(২) ধারা** অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষসমূহকে জনগণের আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। **১০(৪) ধারা** অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত

কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা ইত্যাদি এই আইনের দ্বারা সৃষ্ট **তথ্য কমিশনকে** জানাতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত অনেক সরকারী ও বেসরকারি কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও সব সংস্থার কাছ থেকেই তথ্য চাইতে জনগণের আইনতঃ কোন বাধা নেই। কারণ, যেসব কার্যালয়ে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি সেগুলোতে আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায় অফিস প্রধানের উপর বর্তায়। তাই 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' সম্বোধন করে তার কাছে আবেদন করা যাবে। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে তবে নিম্নলিখিত উপায়ে জেনে আবেদন জমা দেয়া যায় -

ক. উক্ত অফিসের অফিস প্রধানকে জিজ্ঞেস করা যে, কার কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

খ. তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (**http:// infocom.gov.bd**) এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টালে দেখা যেতে পারে।

গ. তথ্য কমিশনের কাছ থেকে ফোনে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

ঘ. তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে আবেদন করে জেনে নেওয়া।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য জানার জন্য অবশ্যই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। তিন রকম প্রক্রিয়ায় আবেদন পত্র পাঠানো যায়। এক. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হাতে হাতে জমা দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে নেওয়া; দুই, রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আবেদন পত্র পাঠিয়ে দিয়ে ডাক রশিদটি সংরক্ষণ করা; তিন, ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠিয়ে কপি সংরক্ষণ করা।

আইনের **২(ঘ) ধারা** অনুযায়ী "তথ্য প্রদান ইউনিট" বলতে সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা তাদের অধীনস্থ কোন প্রধান বা বিভাগীয় বা আঞ্চলিক বা জেলা বা উপজেলা কার্যালয় বোঝায়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদকে 'তথ্য প্রদান ইউনিট'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ সর্বনিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সরকারী অফিসের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া যাবে।

৮. জনগণ কোন্ ধরনের তথ্য কীভাবে পেতে পারে ?

এই আইনে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া (যে ব্যাপারে আ্ইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে) জনগণ সরকারী কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সরকারের কাছে আছে বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সব তথ্যই চাইতে পারবে। এসব তথ্য জনগণ সরকারী ফাইল, দলিল, রেকর্ড ইত্যাদি দেখার মাধ্যমে অথবা প্রয়োজনে সরেজমিন পরীক্ষার মাধ্যমে (যেমন কার্যাদেশ অনুযায়ী রাস্তা তৈরীতে ইট, পাথর, বালু, পিচ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা) পেতে পারে। ফাইল দেখে তথ্য নোট করে আনতে পারে, ফাইল কিংবা দলিলের

ফটোকপি সংগ্রহ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, কোন কর্তৃপক্ষ শুধু যেসব তথ্য তাদের কাছে আছে সেসব তথ্যই দিতে পারবে। নতুন করে তৈরী করা, বানোয়াট কোন তথ্য বা তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। মৌখিক কোন কিছু 'তথ্য' বলে গণ্য হবে না। আর তথ্য ঠিক যেভাবে ফাইলে আছে সেইভাবেই দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারী কোন চিঠি কেউ দেখতে চাইলে, শুধুমাত্র সেই চিঠিই তাকে দেখতে দিতে বা কপি করে দিতে হবে। কোন সারসংক্ষেপ বা অন্য কোন আকারে বা নতুন কিছু তৈরী করে দিলে চলবে না।

৯. কোন্ ধরনের তথ্য এই আইনের আওতায় পড়বে না ?

যদিও তথ্য অধিকার আইনে সরকারী বেশিরভাগ তথ্যই জনগণের জানার আওতায় আনা হয়েছে, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু কিছু তথ্য সরকার আইনতঃ এখনো গোপন রাখতে পারবে। এইসব তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে দিতে বাধ্য হবে না। যেসব তথ্য সরকার দিতে বাধ্য নয় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : যেসব তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন হতে পারে; অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে এ রকম তথ্য; যে তথ্য প্রকাশের ফলে অন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; যে সব তথ্য প্রকাশের ফলে আইনের প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ইত্যাদি। মোটকথা, যেসব তথ্য প্রকাশের ফলে দেশ বা দশের ক্ষতি হতে পারে বা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন হতে পারে এরকম তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ কাউকে দিতে বাধ্য নয়। আরো একটু পরিষ্কার করে বলা যায়, যেসব তথ্য প্রকাশ করলে দেশের সুরক্ষা, দেশের নীতি ও কৌশল, দেশ বিজ্ঞান বা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যেসব তথ্য কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত বা অপরাধে উৎসাহ জোগাতে পারে, যে সব তথ্য দিলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে সেসব তথ্য সরকার প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। কি কি তথ্য কর্তৃপক্ষ কাউকে দিতে বাধ্য নয় তার সম্পূর্ণ তালিকা আইনের **৭ নম্বর ধারায়** দেয়া আছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য না দেবার এই বিধান থাকার ফলে সরকারী কয়েকটি কর্তৃপক্ষকেও তথ্য প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয় এবং তারা তথ্য দিতে বাধ্য নয়। আইনের **৩২ ধারায়** বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এদের মধ্যে এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, এসএসএফ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, র‍্যাবের গোয়েন্দা সেল, জাতীয় রাজস্ববোর্ডের গোয়েন্দা সেল অন্তর্ভুক্ত। তথ্য অধিকার আইনের প্রথম তফসিলে এইসব সংস্থার তালিকা দেয়া হয়েছে।

তবে **৩২(২) ধারায়** এও বলা হয়েছে যে, উপরিল্লিখিত যেসব সংস্থাকে তথ্যপ্রদানে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য যদি দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়, তাহলে সেইসব সংস্থা সেসব তথ্য আবেদনকারীকে দিতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে কোন সংস্থা মানবাধিকার বা দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদানে অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন, গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তির শারীরিক বা স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য।

১০. অন্য কোন আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে কী হবে ? :

এই আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনের কোন ধারার সঙ্গে এই আইনের কোন ধারার বিরোধ হলে, তথ্য অধিকার আইনই প্রাধান্য পাবে বলে আইনে বলা হয়েছে। যেমন, দেশের বিদ্যমান **"দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯২৩"** অনেকটাই অকেজো হয়ে গেছে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে। অর্থাৎ আগে সরকার গোপনীয়তা আইনের অজুহাত দেখিয়ে যেসব তথ্য গোপন রাখতে পারতো এখন আর তা পারবে না । একইভাবে **সাক্ষ্য আইনের** (Evidence Act 1872) সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে তথ্য অধিকার আইনই প্রাধান্য পাবে। **(৩ নম্বর ধারা)।**

১১. তথ্য সংরক্ষণ

তথ্য অধিকার আইনের **৫ নম্বর ধারা** অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের যাবতীয় তথ্য এখন থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কেউ চাইলে তাকে সেখান থেকে সহজে সেসব তথ্য দেয়া যায়। অর্থাৎ তথ্যের ক্যাটালগ/ইনডেক্স ইত্যাদি তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশ ও সংরক্ষণ বিধিমালা দ্রষ্টব্য।

১২. তথ্য প্রকাশ, স্বেচ্ছা প্রকাশ ও বার্ষিক রিপোর্ট

তথ্য অধিকার আইনের **৬ নম্বর ধারা** অনুযায়ী আইনটি চালু হবার পর থেকে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ জনগণ জানতে চাইতে পারে এমন সব বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে তা নাগরিকদের জানানোর জন্যে নিয়মিতভাবে নিজে থেকেই তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে। একে "স্বেচ্ছাপ্রকাশ" বা "proactive disclosure" বলা হয়। অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করা শুরু করেছে। তাছাড়া আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের সারা বছরের কাজের তথ্য দিয়ে একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করবে। তাতে নাগরিকদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সব রকম কাজের বিবরণ ও সেই সংক্রান্ত সব তথ্য ও ব্যাখ্যা থাকবে।

১৩. তথ্য পেতে হলে একজন নাগরিককে কী করতে হবে ? এককভাবে না অনেকে মিলে আবেদন করা যাবে ?

কোন ব্যক্তি কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানতে চাইলে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। তবে আবেদনকারীর পক্ষে যদি সরাসরি হাতে হাতে অফিসে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে বা ডাকযোগে কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমেও এই আবেদন পাঠানো যাবে। সরাসরি হাতে হাতে আবেদনপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে অফিসের দায়িত্ববান কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বা রিসিভড্ কপি চেয়ে নিতে হবে। উক্ত রিসিভড কপিতে আবেদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদবী ও তারিখসহ সীল-স্বাক্ষর থাকতে হবে। আর ডাকযোগে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে পাঠানো জরুরী। এতে কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করার সুযোগ থাকে না। আবেদন করার জন্যে মুদ্রিত ফরমের কথা আইনের **৮(৩) ধারায়** বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ইতিমধ্যে যে বিধিমালা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের নমুনা হিসেবে একটি ফরম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। (ফরম সম্পর্কে জানতে তথ্য অধিকার আইনের বিধিমালা দেখুন)। এই ফরম অনুযায়ী আবেদনপত্রে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখতে হবে। তাছাড়া যে তথ্যের জন্য আবেদন করা হচ্ছে তার সঠিক বর্ণনা, কিভাবে আবেদনকারী সে তথ্য গ্রহণ করবে অর্থাৎ ফাইল দেখার মাধ্যমে, ফাইলের অনুলিপি নিয়ে, নোট নিয়ে, বা অন্য কোন উপায়ে নেবে তা জানাতে হবে। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানাসহ আবেদনের তারিখ সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনে কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, শুধুমাত্র ব্যক্তিই তথ্যের জন্যে আবেদন করতে পারবে, কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা গোষ্ঠী আবেদন করতে পারবে না। যেহেতু কোথাও 'না' বলা হয়নি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, অনেকে মিলে আবেদন করতে কোন অসুবিধে নেই। আইনের **৮ ধারার ৫ উপধারায়** "ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী" কথার উল্লেখ এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে বলে মনে হয়। তবে বিধিমালায় দেয়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের যে ফরম 'ক' ছাপানো হয়েছে তাতে একক ব্যক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তি-শ্রেণীর একত্রে তথ্য আবেদন করার কোন সুযোগ নেই। এ ধরনের আবেদন করে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তথ্য কমিশনের শরণাপন্ন হওয়া যায়।

১৪. তথ্য পাবার জন্যে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে কি ?

তথ্য পাবার জন্যে আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধ করার কথা আইনের **৮ (৪) (৫) (৬) ধারায়** বলা হয়েছে। সরকার বিধিমালায় বর্ণিত ফরম 'ঘ'-তে তথ্য প্রাপ্তির

অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ) এ-৪ ও এ-৩ মাপের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য প্রদান করতে হবে। আবার ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রকৃত মূল্য প্রদান করতে হবে। তবে কোন আবেদনকারী যদি ডিস্ক, সিডি নিজেই সরবরাহ করে তথ্য নিতে ইচ্ছুক থাকে সেক্ষেত্রে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। এছাড়া কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যও বিনামূল্যে পাওয়া যাবে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সংযোজনী-২ এর বিধিমালায় নির্ধারিত ফরম 'ঘ' দেখুন)। তথ্যের মূল্য নগদ, ট্রেজারী চালান, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদির মাধ্যমেও পরিশোধযোগ্য।

১৫. আবেদনপত্র পাবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কী করতে হবে?

আইনের **৯ নম্বর ধারায়** বলা হয়েছে যে, তথ্যের জন্যে কোন নাগরিকের কাছ থেকে অনুরোধ পাবার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সে তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ করতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা যদি অন্য কোন তথ্য প্রদানকারী ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যোগাড় করতে হয় তাহলে এই সময় ৩০ কার্যদিবস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। আর যদি কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করতে না পারেন তাহলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাবার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে জানাতে হবে। অবশ্য আইনের **৯(৪) ধারায়** এও বলা হয়েছে যে, যদি কোন তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেপ্তার বা কারাগার থেকে মুক্তি সংক্রান্ত হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্ততঃ প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তথ্য দেবার এই সময়সীমার মধ্যে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার বিধান আইনে করা হয়েছে।

আবেদনকারীকে মনে রাখতে হবে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন মৌখিক তথ্য গ্রহণ করলে পরে তার ভিত্তিতে অন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। যেমন আপীল করা যাবে না বা তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে না। তাই আবেদনপত্রের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সবসময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, পদবী, সীল, স্বাক্ষর ও তারিখ সহকারে লিখিত উত্তর চেয়ে নিতে হবে, যাতে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের একটা প্রমাণ বা ভিত্তি থাকে। কারণ, আবেদনকৃত তথ্যের সাথে যেহেতু দুর্নীতির একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, তাই সংগৃহীত তথ্যে যদি উল্লেখিত প্রমাণ না থাকে তাতে আবেদনের বিষয়ে সঠিক তথ্য লাভের ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আপীল ও অভিযোগ করার সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, আবেদনকৃত তথ্য প্রদানে যদি কর্তৃপক্ষের কোন ব্যয় হয় তাহলে সে ব্যয় আবেদনকারীকে বহন করতে হবে এবং তার ন্যায্যমূল্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধিমালা অনুযায়ী **(আইনের বিধিমালার ৮ নম্বর ধারার ফরম - ঘ** দ্রষ্টব্য) নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত মূল্যে হবে অর্থাৎ ফটোকপি, প্রিন্ট আউট ইত্যাদিতে যে ব্যয় হয় শুধু সে ব্যয়ই আবেদনকারীকে বহন করতে হবে। কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধীর (যেমন, অন্ধ, বধির) ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য লাভ করার জন্য যাবতীয় সহায়তা দিতে আইনতঃ বাধ্য করা হয়েছে।

১৬. অনুরোধকৃত তথ্য না পেলে কার কাছে আপীল করতে হবে এবং আপীল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী ?

কোন ব্যক্তি তাঁর অনুরোধকৃত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পেলে অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পাননি বা আবেদন হারিয়ে গেছে বলে জানালে বা তাঁর দেয়া কোন সিদ্ধান্তে খুশি না হলে তিনি পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যে সংস্থার কর্তৃপক্ষের (ইউনিটের) কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে, আইনের **২৪ ধারা** অনুযায়ী সেই সংস্থার বা ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয়ের কাছে আপীল করতে পারবেন। তবে আবেদনকারী যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে না পারেন তাহলে ২৪(২) ধারা অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ তার আপীল গ্রহণ করতে পারবেন। এই আপীলে মূল আবেদনপত্রের ও তার সঙ্গে সংযুক্তির কপি এবং ডাকযোগে পাঠানো আবেদনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি রসিদ জুড়ে দিতে হবে। আইনের **২(ক) ধারায়** "আপীল কর্তৃপক্ষের" সংজ্ঞা বিশদভাবে দেয়া হয়েছে। এই আপীল পাবার ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেবেন অথবা আপীল আবেদনটি অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তা খারিজ করে দিতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি কোন কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপীল করতে হবে। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব হচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সেখানে আপীল কর্মকর্তা হচ্ছেন চেয়ারম্যান।

১৭. আপীলের রায় না পেলে বা তা সন্তোষজনক না হলে কার কাছে অভিযোগ করতে হবে?

কোন ব্যক্তি সময়মত ওপরে উল্লিখিত আপীলের কোন রায় না পেলে বা তার কাছে আপীলের রায় সন্তোষজনক মনে না হলে তিনি সরাসরি **তথ্য কমিশনের** কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। আইনের **২৫ ধারায়** কি কি কারণে এই অভিযোগ করা যাবে তার উল্লেখ আছে। এতে বলা হয়েছে যে, ধারা **১৩-র উপধারা (১)** এ উল্লিখিত কারণে তথ্য

প্রাপ্ত না হলে বা **ধারা ২৪**-এর অধীনে প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, সরকার তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার জন্য একটি অভিযোগ দায়েরের ফরম তৈরী করেছেন। [তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩(১) দ্রষ্টব্য]। আবেদনকারীকে আবেদন সংক্রান্ত সব কাগজপত্রের ফটোকপি অভিযোগপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। যেমন, তথ্য চাইবার আবেদনপত্র ও আপীলের কপি, প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের কপি বা রিসিভড্ কপি বা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠানোর ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের প্রদত্ত রসিদ বা ই-মেইলে-এর কপি এবং কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদানের অপারগতার নোটিশ কপি বা আংশিক বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে তার কপি ইত্যাদি। তবে অভিযোগপত্র সবসময় হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া বা রেজিষ্টার্ড ডাকে পাঠানোই ভালো।

১৮. তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী ?

তথ্য অধিকার আইন ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্যে এবং আইন অমান্য করা হলে তার প্রতিবিধানের জন্য একটি তথ্য কমিশনের ব্যবস্থাও আইনে আছে। আইনের **১১ ধারার** ভিত্তিতে সরকার ইতিমধ্যে একটি তথ্য কমিশন গঠন করেছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে কমিশন জনগণের কাছ থেকে এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ ক'রে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা করবে। যেমন, সময়মত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা, আবেদনপত্র গ্রহণ না করা, সময়মত জবাব বা তথ্য না দেয়া, অযৌক্তিক মূল্য দাবী করা, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি। তথ্য কমিশনে আছেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ২ জন তথ্য কমিশনার। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী কি তার বিবরণ আইনের **১৩ ধারায়** বিশদভাবে দেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশন ২৫নং ধারার **১১ নং উপধারার** ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, কমিশন অভিযোগ খারিজ করতে পারে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নতুনভাবে পদক্ষেপ নিতে বলতে পারে। এছাড়াও কমিশন যদি মনে করে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন অমান্য করেছেন তাহলে তাঁকে জরিমানা করতে পারবে। আইনের **২৭ নম্বর ধারায়** জরিমানার বিধান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বা এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানাতে না পারলে কিংবা ভুল, অসম্পুর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তথ্য কমিশন তাকে তথ্য দেবার জন্য নির্দিষ্ট দিনের পর থেকে প্রতিদিন ৫০/- টাকা করে অনধিক ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারবে।

১৯. তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাবে কী ?

তথ্য অধিকার আইনের **ধারা ২৯** অনুযায়ী তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তথ্য কমিশন একটি দেওয়ানী আদালতের মত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে সমন জারী ক'রে, কমিশনের সামনে হাজির হবার জন্যে বাধ্য ক'রে, তথ্য-প্রমাণ, দলিলপত্র, সাক্ষ্য ইত্যাদি তলব করতে পারবে। অর্থাৎ তথ্য কমিশনকে একটি দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে সংবিধানের **১০২ ধারা** অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি তথ্য কমিশনের দায়িত্বের ব্যাপারে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে।

২০. উপসংহার

অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের তথ্য অধিকার আইনে বেশ কিছু ঘাটতি আছে বলা যায়। যেমন, আদালতে যাবার সুযোগহীনতা, তৃতীয় পক্ষের সাথে জড়িত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে অস্পষ্টতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-বিষয়ক তথ্য সমূহের চিরস্থায়ীত্ব ইত্যাদি। তবে আইনে যেটুকু দেয়া হয়েছে তা-ই আগে ভালোভাবে চালু হোক এবং এর সুফলগুলো সকলে জানুক ও ভোগ করুক, তাহলে ঘাটতিগুলো পূরণ করার জন্য তাদের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দাবী উঠে আসবে। আইনটি সম্পুর্ণভাবে কার্যকর করার ব্যাপারে দেশের সকল নাগরিকেরই যে গুরুদায়িত্ব আছে তা সকলকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সরকারের কাছ থেকে কি ধরনের তথ্য পেলে সাধারণ মানুষের উপকার হবে?

সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের সমস্যা, হয়রানী বা বঞ্চনার সম্মুখীন হয় যার অন্যতম কারণ তারা সরকারের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক তথ্যই জানে না, সরকার সেসব তথ্য তাদের জানায় না বা জানতে দেয় না। যেমন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তারা জানে না কতগুলো কার্ড তাদের অঞ্চলের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিভাবে কার্ডগুলো বন্টনের ব্যবস্থা করেছে, কারা তালিকার নাম বাছাই করেছে এবং নিয়ম অনুযায়ী এই বাছাই হয়েছে কিনা। এই তথ্যগুলো জানলে বা সেই সংক্রান্ত ফাইল দেখতে পারলে তারা নিশ্চিত হতে পারতো কার্ড বন্টন নিয়ম মত হয়েছে কিনা, তাতে কোন পক্ষপাতিত্ব বা কারচুপি হয়েছে কিনা, ইত্যাদি। আগে এসব তথ্য সরকার আইনতঃ জনগণকে দিতে বাধ্য ছিল না, এখন তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবিকা, কৃষি, রাস্তা-ঘাট-ব্রীজ তৈরী বা মেরামত, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে জনগণ সরকারী কাজের এই ধরনের ভেতরের তথ্য জানতে পারলে অনেক উপকৃত হবে, তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহও তাদের কাজে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা স্থাপন করতে উদ্যোগী হবে, তাও নিশ্চিত করে বলা যায়। আর তা নিশ্চিত করার জন্যেই দেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়েছে। এখন জনগণকেই এই আইন ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে। তা না হলে এই অতি সম্ভাবনাময় একটি আইন কাগুজে আইনেই পরিণত হবে, জনগণের কোন উপকারে আসবে না। তাই জনগণকেই উদ্যোগী হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে আবেদন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যেসব তথ্য সরকার প্রকাশ করেনি বা সাধারণতঃ প্রকাশ করে না, যে সব তথ্য এতদিন সরকারের অন্দরমহলের খবর হিসেবে পরিগণিত হত, শুধু সেই সব তথ্যই চাইতে হবে। যে তথ্য প্রকাশিত হয়ে গেছে সেসব তথ্য পাবার জন্যে আবেদন করতে হয় না, সঠিক জায়গা বা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সবাইকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, সাধারণ অর্থে তথ্য আর তথ্য অধিকার আইনের তথ্য একেবারে ভিন্ন বিষয়। শুধু সরকারি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যই এই আইনের আওতায় পড়ে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুঝতে ভুল করে।

কোন ব্যাপারে কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানতে হলে প্রথমেই ঠিক করতে হবে যে, আমরা ঠিক কি তথ্য চাইছি, আর এই তথ্য পাবার জন্য কার কাছে আবেদন করতে পারি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করতে পারি, ঠিক কোন্ বা কি তথ্য আমাদের কাজে লাগবে। মনে রাখতে হবে যে, আমরা শুধু তথ্যই চাইতে পারি, অর্থাৎ যা সরকারের কাছে ফাইলে বা অন্য কোনভাবে সংরক্ষণ করা আছে। কোন কিছু তৈরী করে দেওয়া বা কোন কিছুর ব্যাখ্যা - তা চাওয়া যাবে না। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়: আমাদের পাড়ায় এত ঘন ঘন লোডশেডিং হয় কেন - এটা জানতে না চেয়ে, জানতে চাইতে হবে লোডশেডিং-এর ব্যাপারে সরকার কি কি সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থা নিয়েছে।

অবেদনপত্র একজন ব্যক্তির নামেই পাঠানো ভালো। আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এতদিন কোন কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে ভয় পেত। এখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই। বরং আবেদনকারীকে সময় মত সঠিক উত্তর না দিলে আইনে সেই কর্তৃপক্ষের জন্যেই শাস্তির বিধান দেয়া আছে। তাছাড়া জনগণকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে দেশে অনেক তথ্য অধিকার কর্মী তৈরী হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, সরকারি কর্তৃপক্ষ ছাড়া কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা সরকারি পয়সায় বা বিদেশী পয়সায় চলে, তারাও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পড়ে।

তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। চিঠি রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে হাতে হাতে দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে আনাই ভালো। অফিসে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাঁর কাছেই আবেদন করতে হবে। বিভিন্ন খাতে কোথা থেকে তথ্য চাওয়া যাবে তার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

বিভিন্ন খাতে কোথা থেকে তথ্য চাওয়া যাবে তার কিছু নমুনা

ভূমি খাতে	**কোন অফিসে আবেদন করতে হবে**
এলাকায় সরকারী খাস জমির পরিমাণ কত এবং কোন কোনটি খাস জমি তার তালিকা পাবার জন্য আবেদন ইত্যাদি।	উপজেলা ভূমি অফিস
শিক্ষা খাতে	
স্থানীয় সরকারী স্কুলে শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়ার ব্যাপারে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, শিক্ষকদের স্কুলে উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য, ইত্যাদি	উপজেলা শিক্ষা অফিস
কৃষি খাতে	
এলাকায় কোন ডিলার কত বস্তা সার পাবে বলে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য, ইত্যাদি।	উপজেলা কৃষি অফিস
রাস্তাঘাট সম্বন্ধে	
কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের কোন এলাকার কত কি. মি. রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে, কারা সিদ্ধান্ত	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার

নিয়েছেন তাদের নামের তালিকা ও সিদ্ধান্তের কপি, ইত্যাদি ।	কার্যালয়
ত্রাণ খাতে	
উপজেলায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগে কতটুকু ত্রাণ বরাদ্দ হয়েছে, কারা ত্রাণ পেয়েছে এবং তার পরিমাণ কত, ইত্যাদি ।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
সেফটি নেট কর্মসূচী সম্বন্ধে	
প্রতি ইউনিয়নে ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি কার্ড বরাদ্দের পরিমাণ কত এবং কার্ড বন্টন প্রক্রিয়া কি, ইত্যাদি ।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
স্বাস্থ্য খাতে	
উপজেলা হাসপাতালে আউটডোরের ডাক্তারের উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য, কোন্ কোন্ ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে তার তালিকা, ইত্যাদি ।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদন ও অভিযোগপত্রের নমুনা

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ----------

পিতার নাম ঃ ----------

মাতার নাম ঃ ----------

বর্তমান ঠিকানা ঃ ----------

স্থায়ী ঠিকানা ঃ ----------

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ ----------

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ ----------

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ ----------

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

আবেদনের তারিখ ঃ ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আপীল আবেদন

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	ঃ ----------
২। আপীলের তারিখ	ঃ ----------
৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে উহার কপি (যদি থাকে)	ঃ ----------
৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	ঃ ----------
৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ ----------
৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ঃ ----------
৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	ঃ ----------
৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	ঃ ----------
৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	ঃ ----------

আবেদনের তারিখ ঃ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিযোগ দায়েরের ফরম

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং----------

১.	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	ঃ ----------
২.	অভিযোগ দাখিলের তারিখ	ঃ ----------
৩.	যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা	ঃ ----------
৪.	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রযোজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)	ঃ ----------
৫.	সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	ঃ ----------
৬.	প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা	ঃ ----------
৭.	অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	ঃ ----------

আবেদনের তারিখ ঃ ----------

সত্যপাঠ

আমি/ আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

নমুনা : তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর
ড: গোলাম হোসেন,
প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১।	আবেদনকারীর নাম	: মো: নিয়ামত আলী
	পিতার নাম	: মো: রসুল আলী
	মাতার নাম	: মোছা: দিলরুবা বেগম
	বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
	স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও	: mdalibangla007@gmail.com,
	মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	: 01715000000

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) : বংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করছি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref.No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/ 2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

১.(ক) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজন মতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

১. (খ) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যেসব প্রার্থী আবেদন করেছে তাদের নামের তালিকা ও আবেদনকারীদের প্রার্থীত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি যে নম্বরপত্র (স্কোরশীট) প্রণয়ন করেছে তার নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

১. (গ) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে কর্তৃপক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যে যেসব প্রার্থীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি ইস্যু করা হয়েছে সেসব চিঠি প্রেরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র/ইস্যু রেজিস্টার সহ যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

আশাকরি, আইনের ৯(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য নির্ধারিত ২০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করবেন।

৩।	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি/অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)	: অফিসে যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত কপি গ্রহণের মাধ্যমে।
৪।	তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	: মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	: প্রযোজ্য নহে।

আবেদনের তারিখ ঃ ০৯ মে ২০১৩

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নমুনা : আপীল আবেদন

বরাবর
মো: ফখরুদ্দিন,
পরিচালক
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১।	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	:	মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা। ই-মেইল:mdalibangla007@gmail.com ; ফোন: ০১৭১৫ ০০০০০০
২।	আপীলের তারিখ	:	১৫ জুন ২০১৩
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে উহার কপি (যদি থাকে)	:	কোন আদেশ প্রদান করা হয়নি।
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	:	ড: গোলাম হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৫।	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাংলাদেশ এর ৮ (১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref.No.BSRI/P102/RangpurEmployment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

১.ক) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

১.খ) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে সব প্রার্থী আবেদন করেছে তাদের নামের তালিকা ও আবেদনকারীদের প্রার্থীত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি যে নম্বরপত্র (স্কোরশীট) প্রণয়ন করেছে তার নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

১.গ) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে কর্তৃপক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যে যেসব প্রার্থীকে সাক্ষাৎকার (Interview) এ উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি ইস্যু করা হয়েছে সেসব চিঠি প্রেরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র/ইস্যু রেজিস্টার সহ যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

উল্লেখ্য যে, একই আইনের ৯ (১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। তাই আপীল করতে বাধ্য হচ্ছি।

৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	:	প্রযোজ্য নয়।
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	:	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারা সমূহ
৮।	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	:	এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আপীলে বর্ণিত আমার সকল তথ্য সঠিক।
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	:	ডাকযোগে প্রেরিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের কপি ও রসিদ কপি।

আবেদনের তারিখ ঃ ০৭ জুলাই ২০১৩

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নমুনা : অভিযোগ দায়েরের ফরম

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং----------

১.	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	ঃ	মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা। ই-মেইল:mdali007@gmail.com, ফোন: ০১৭১৫০০০০০০
২.	অভিযোগ দাখিলের তারিখ	ঃ	০৭ জুলাই ২০১৩
৩.	যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা	ঃ	ডঃ গোলাম হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
৪.	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রযোজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)	ঃ	গত ০৯ মে ২০১৩ তারিখে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি :

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No.. BSRI/ P-102/Rangpur Employment/ 2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

১.ক) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

১.খ) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে সব প্রার্থী আবেদন করেছে তাদের নামের তালিকা ও আবেদনকারীদের প্রার্থীত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি যে নম্বরপত্র (স্কোরশীট) প্রণয়ন করেছে তার নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

১.গ) উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে কর্তৃপক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যে যেসব প্রার্থীকে সাক্ষাৎকার (Interview) এ উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি ইস্যু করা হয়েছে সেসব চিঠি প্রেরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র/ইস্যু রেজিস্টার সহ যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

উল্লেখ্য যে, আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। তাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গত ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে আপীল করতে বাধ্য হই। সেখান থেকেও আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ার কারণে অভিযোগ করছি।

৫.	সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধেঅভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	ঃ	প্রযোজ্য নয়
৬.	প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা	ঃ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ।
৭.	অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	ঃ	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ও আপীল আবেদনের কপি এবং ডাক বিভাগের প্রদত্ত রসিদ কপিসমূহ এই অভিযোগ পত্রের সাথে সংযুক্ত করা গেল।

অভিযোগ দায়েরের তারিখ ঃ ৩০ জুলাই ২০১৩

সত্যপাঠ

আমি/ আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

চতুর্থ অধ্যায়
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইনের সুফলের কিছু উদাহরণ

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৯০টি দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর রয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণ সেসব দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের জন্যে আবেদন করে যেসব সুবিধা/উপকার লাভ করেছে নিচে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। এগুলো থেকে অনুধাবন করা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের বিস্তার, পরিধি ও ব্যবহার কত বিচিত্র হতে পারে।

এক. ভারতের কয়েকটি উদাহরণ

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয় ২০০৫ সালে। তারপর থেকে গত পাঁচ বছরে এ আইনের প্রয়োগ যেভাবে বিস্তার ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা আগে কেউ ভাবতেই পারেনি। সারা ভারতব্যাপী এখন অনেক তথ্যকর্মী তৈরী হয়েছে যারা জনগণকে তথ্য আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে সহায়তা করছে। তথ্য অধিকার আইন এত কম সময়ে এত বেশী ব্যবহার হয়েছে যে, সরকারী অফিসগুলো এখন তাদের কাজের ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক সতর্ক ও সচেতন হয়েছে। আগে যেসব তথ্য গোপন রাখা হত তা এখন অনেকটাই তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বেচ্ছা-প্রকাশ (Proactive Disclosure) করছে। অনেকের মতে ভারতের এই তথ্য অধিকার আইনই সরকারের কাজে স্বচ্ছতা আনতে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এখন একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে যার ফলে সরকারী অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতি উদঘাটন হচ্ছে এবং জনগণ লাভবান হচ্ছে। নিচে ভারত থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ।

ক) "রেশন কার্ডের আবেদনের জন্য এখন প্রত্যেক দিনই শনিবার" : ভারতের গুজরাট রাজ্যের পাঁচমহল জেলার কলোল তালুক অনুন্নত একটি এলাকা। সেখানে অধিকাংশই দরিদ্র মানুষের বসবাস। দরিদ্রজনেরা রেশন কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পেয়ে থাকে। তাই রেশন কার্ড করানো দরিদ্র মানুষের জন্য অতীব জরুরী একটি বিষয়। তালুক পর্যায়ে ডেপুটি মামলতদার রেশন কার্ড ইস্যু করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ছাপানো আবেদনপত্রে লেখা আছে জনগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ রেশনকার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবে । তবে কলোল এলাকায় মামলতদারের অফিসের বাইরের দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা পোস্টারে জনগণকে জানানো হয় যে, শুধুমাত্র শনিবার সেই অফিসে রেশনকার্ড সংক্রান্ত কাজ করা

হবে। এদিকে গুজরাট রাজ্যে সরকারী অফিস প্রতিমাসে মাত্র প্রথম এবং তৃতীয় শনিবার খোলা থাকে। এর অর্থ মাসে দুইদিন জনগণ রেশনকার্ডের কাজ করার সুযোগ পায়। এর ফলে জনগণের ভোগান্তি বাড়ে। যারা টাকা পয়সা খরচ করতে পারে তারা লাইনে আগে গিয়ে কাজ করে নেয়, যারা পারে না তাদেরকে পরের শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কলোলের অধিবাসী আসলাম ভাই এই ব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে ঠিক করেন যে, ডেপুটি মামলতদারের সঙ্গে দেখা করবেন, মাসে শুধু দুই শনিবারের মধ্যে সময়সীমা সীমিত রাখার কোন আইনগত ভিত্তি আছে কিনা জানার জন্যে। ইতিমধ্যে তিনি জেনেছেন যে, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একজন নাগরিক প্রায় যে কোন সরকারী তথ্য জানতে এবং পেতে পারে। তাই শুধুমাত্র শনিবারই রেশনকার্ড সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে এই সংক্রান্ত কোন সরকারী সিদ্ধান্ত আছে কিনা জানতে চেয়ে আসলাম ভাই আবেদন করবেন ঠিক করেন।

গুজরাটের তালুক পর্যায়ে উক্ত মামলতদারই সরকারি তথ্য অফিসার হিসেবে কাজ করেন। যখন আসলাম ভাই তাঁর কাছে আবেদনপত্র দিতে যান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, জনগণকে তথ্য দেবার কোন আদেশ নেই। আসলাম ভাই তখন রেজিস্টার্ড ডাকে প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র সহ সেই আবেদন পাঠান এবং তা গৃহিতও হয়। ১৫ দিন পর আসলাম ভাইকে ডেপুটি মামলতদার ডাকেন আলোচনার জন্য, কিন্তু আসলাম ভাই তাতে রাজী হননা। তখন তিনি আসলাম ভাইয়ের বাবাকে বলেন, আবেদনপত্রের যে অংশে শনিবারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে সেই অংশ আসলাম ভাইকে বাদ দিতে হবে। তিনি তাঁকে নিশ্চিত করেন যে, প্রকৃতপক্ষে শনিবারের কোন সীমাবদ্ধতা নেই, প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এটা করা হয়েছিল। এই বিষয়টি যদি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যায় তাহলে তার শাস্তি হতে পারে। আসলাম ভাই ডেপুটি মামলতদারকে বলেন যে, সে যদি তথ্য না দিতে চায় তাহলে প্রত্যাখ্যান পত্র লিখে দিক। তাহলে সে রাজ্য তথ্য কমিশনে আপীল করবে। অবশেষে ডেপুটি মামলতদার বাধ্য হয়ে সব ব্যাখ্যাসহ চিঠির উত্তর দেয়। এরপর থেকে সেই অফিস সরকারী সব কার্য দিবসেই রেশনকার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে জনগণের হয়রানি লাঘব হয়। এভাবেই দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন বঞ্চিত জনগণের জন্য ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনতে পারে। সরকারী অফিসগুলোকে আইন অনুযায়ী চালাবার অস্ত্র জনগণের হাতেই রয়েছে।

খ) "বিনা কাজে একজন শিক্ষক দশ লাখ টাকা বেতন নিচ্ছেন": একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা মোটা বেতন নিয়েও তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেন না। অনেক শিক্ষক স্কুল-কলেজে মাত্র ৩-৪টি ক্লাস নেন এবং তাদের বেতনের দ্বিগুণ আয় করেন প্রাইভেট টিউশনি করে। এমনকি অনেক শিক্ষক আছেন যারা একটাও ক্লাস না ক'রে, ছাত্র না পড়িয়েও বছরের পর বছর বেতন নেন।

ব্যাঙ্গালোর শহরে হেগড়ে নামে একজন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে এম. এম. আর্ট এন্ড সাইন্স কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের

কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। আবেদনপত্রে তিনি লেখেন যে, তিনি জেনেছেন উক্ত কলেজে একজন শিক্ষক গত তিন বছর ধরে ভূ-তত্ত্ব বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি জানতে চান, কলেজে ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে আর কোন শিক্ষক আছে কিনা, কতজন ছাত্র এই বিষয়ে পড়ে এবং শিক্ষককে বেতন হিসেবে কত টাকা দেয়া হয়। দ্রুতই এই আবেদনপত্রের জবাব দেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। জবাবে বলা হয় যে, একজন ছাত্রও এই বিষয়ে পড়ে না, তবুও একজন শিক্ষক গত তিন বছর ধরে কোন কাজ না করেই বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। এটাও জানানো হয় যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ সরকারের সাথে অনেকবার যোগাযোগ করেছে উক্ত শিক্ষকের বদলীর ব্যাপারে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। এরপর হেগড়ে সাহেব ব্যাঙ্গালোরের শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে আবেদন করলে জয়েন্ট ডিরেক্টর সবকিছু স্বীকার করে আবেদনকারীকে জানান যে, এর ফলে সরকার সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কেন এব্যাপারে কোন একশন নেওয়া হয়নি সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে। পরে আবেদনকারীকে তিনি জানান যে, একশন নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত শিক্ষককে অন্য কলেজে যথাযথ পদে বদলী করা হয়েছে।

গ) জুলিটা বকেয়া মাইনে বুঝে পেলেন : জুলিটা কুমারী বিহারের একটি গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। প্রথম এক বছর স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঠিকমতই মাসোহারা পাচ্ছিলেন। তারপর মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়, দিল্লী থেকে কোন অনুদান আসছে না অজুহাত দেখিয়ে। তবুও আরো এক বছর জুলিটা শিক্ষকতা চালিয়ে যান। তিনি আশা করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর দুজন পুরুষ সহকর্মী ঠিকমত মাসোহারা পাচ্ছেন তাই তিনিও কখনো না কখনো তা পাবেন। জুলিটা কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকটি চিঠি দেন। কিছুদিন পর পঞ্চায়েত অফিসের সেক্রেটারী তাঁকে ডেকে বলে যে, তাকে বকেয়া টাকার অর্দ্ধেক ভাগ দিলে সে তাঁর টাকা ছাড় করিয়ে দেবে। ঠিক সেই সময় একজন এনজিও তথ্যকর্মী তাঁকে আরটিআই-এর ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে সাহায্য করে। আবেদনে শিক্ষকদের বেতন ভাতা সম্পর্কিত সরকারি অর্ডারের কপি; অন্য দুজন পুরুষ সহকর্মী বেতন পেলেও তিনি পাচ্ছেন না কেন তার কারণ; বেতন ছাড় করার জন্য বেতনের অর্দ্ধেক দাবী করা আইনসঙ্গত কিনা; বকেয়া বেতন প্রদানের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ইত্যাদি চাওয়া হয়। আইনমাফিক ৩০ দিনের মধ্যে কোন উত্তর না পেয়ে জুলিটা ব্লক ডেভলেপমেন্ট অফিসারের (বিডিও) কাছে আপীল করেন। বিডিও আবেদনপত্র পেয়েই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে শোকজ নোটিশ দিয়ে তাঁর অফিসে শুনানীর জন্যে ডাকেন। তখন সেক্রেটারী জুলিটাকে তাড়াতাড়ি চেক নিয়ে যাবার জন্যে সংবাদ পাঠান। জুলিটা তা প্রত্যাখ্যান করলে বিডিও-র মধ্যস্থতায় পঞ্চায়েত সেক্রেটারী জুলিটার কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে জুলিটাকে তাঁর বকেয়া তের হাজার টাকা বুঝিয়ে দেন।

ঘ) **রেশন কার্ড সংক্রান্ত দুর্নীতি রোধঃ** ত্রিবেণী নামে এক মহিলা দিল্লীর একজন বস্তিবাসী। ত্রিবেণীর কাছে সরকারী রেশনকার্ড আছে, তবুও অনেকদিন ধরে সে রেশন পায় না। তিনমাস নানা অফিসে ধরনা দিয়ে বিফল হয়ে এবং এ বিষয়ে রেশন দোকানীর

দুর্নীতি সন্দেহ করে, সে আরটিআই-এর অধীনে দিল্লীর খাদ্য দফতরের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করে। সে জানতে/দেখতে চায় যে, তার কার্ডের নামে কত রেশন বন্টন হয়েছে এবং ক্যাশমেমোসহ সব রেকর্ডের কপি। আইন অনুযায়ী একমাসের মধ্যে সে উত্তর পায় যে, তার কার্ডের বিপরীতে দুই টাকা দরে ২৫ কিলো গম ও তিন টাকা দরে ১০ কিলো চাল দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তার টিপসইসহ ক্যাশমেমোর কপিও তাকে পাঠানো হয়। তবে ত্রিবেণী যেহেতু শিক্ষিত তাই তার টিপসই দেবার প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ রেশন দোকানী এতদিন তার রেশন চুরি করে বেশী দামে বাইরে বিক্রি করেছে। ত্রিবেণী এই তথ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেবার আগেই রেশন দোকানী নানা অনুনয়-বিনয় ক'রে তার কাছে মাফ চেয়ে নেয়। এরপর থেকে ত্রিবেণী তার রেশন ঠিকমত পেয়ে আসছে। আর সেই রেশন দোকানীর দুর্নীতিও বন্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঙ) রেশন কার্ড সংক্রান্ত আরো একটি উদাহরণঃ 'পরিবর্তন' নামে একটি এনজিও দিল্লীর বস্তিবাসীদের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজে সহায়তা করে। তারা তথ্য আইনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ক'রে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটন করে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। তারা জানতে পারে যে, রেশন দোকানীরা বছরের পর বছর রেশন সামগ্রী বাইরে বিক্রি করেছে এবং রেশনকার্ডধারীদের ব'লে এসেছে যে, তারা সরকারের কাছ থেকে কোন রেশন সামগ্রী পাচ্ছেনা, তাই রেশন সরবরাহ করতে পারছে না। দোকানীরা এই দুর্নীতি করেছে কার্ডধারীদের নামে নকল কার্ড তৈরী ক'রে, তাদের সই নকল ক'রে ও সেইসব কার্ডের বিপরীতে রেশন সরবরাহ দেখিয়ে। এইসব কেলেঙ্কারী উদঘাটন হবার পর রেশন দোকানীরা জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যায়। তবে আরটিআই-এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আরো কিছু ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু তার পেছনে লেগে না থেকে জনগণ এতেই খুশি যে, দুর্নীতিবাজরা ধরা পড়েছে ও তাদের দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে। তবে এর ভিত্তিতে পরে অনেক দোকানীর লাইসেন্স বাতিল হয়।

চ) ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি উদাহরণঃ ২০০৭ সনে দিল্লীর একজন উকিল ভারতের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অফিসে নিয়োজিত তথ্য কর্মকর্তার কাছে কিছু তথ্য চেয়ে এক আবেদন করেন। তিনি মূলতঃ প্রধান বিচারপতির কাছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও প্রাদেশিক হাইকোর্টগুলোর বিচারপতিদের যে সম্পত্তির হিসাব রক্ষিত আছে সেই সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চান। প্রধান বিচারপতির দফতর থেকে উত্তর আসে যে, তাঁর অফিস তথ্য আইনের এক্তিয়ারে পড়ে না, তাই তিনি তথ্য প্রদানে বাধ্য নন। এই জবাব পেয়ে আবেদনকারী নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার-এর কাছে প্রথম আপীল করেন। সেখান থেকে একই জবাব পাবার পর আবেদনকারী আইনমত দ্বিতীয় আপীল করেন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে। তথ্য কমিশন রায় দেয় যে, বিচার বিভাগের সবাই আরটিআই-এর আওতায় পড়েন কারণ তাঁরা সবাই ভারতের সংবিধান অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত। তথ্য কমিশনের এক্তিয়ার সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান বিচারপতি দিল্লী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। হাইকোর্ট তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। প্রধান বিচারপতি এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেই আপীল

করে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসাব উন্মুক্ত করার ব্যাপারে অনেকদিন ধ'রে সারা ভারতজুড়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলে। অনেক বিজ্ঞ ও প্রাক্তন বিচারপতিগণ এতে অংশ নেন। সরকার বিচারপতিদের পক্ষ নিয়ে পার্লামেন্টে একটি বিলও উত্থাপন করে। কিন্তু সারাদেশব্যাপী প্রতিবাদের মুখে পরে তা তুলে নেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধ'রে বিবেচনার পর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ ২৯শে আগস্ট ২০০৯ সনে সব বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসাব ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে কমিশনের এক্তিয়ার প্রশ্নের এখনো কোন নিষ্পত্তি হয়নি। ভারতের ইতিহাসে সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে এরকম দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক খুবই বিরল। আরটিআই-এর অধীনে মাত্র একজন ব্যক্তির আবেদনের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

ছ) রিক্সাচালক সরকারি অনুদান বুঝে পেলেনঃ "আমার নাম মজলুম। আমি বিহারের মধুচলী জেলার একজন রিক্সাচালক। আমার দারিদ্রের কারণেই আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি রিক্সা টানি। আমি যখন জানতে পারি যে, আমাদের সরকার 'ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে'র মাধ্যমে আমাদের পঞ্চায়েতে আমার নামে ২৫০০০/- টাকা পাঠিয়েছেন, তখন আমি সেই টাকা পাবার জন্য তিন বছর নানা চেষ্টাচরিত করার পরও প্রথম কিস্তির টাকাই তুলতে পারিনি। যতবারই স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে গিয়েছি ততবারই তিনি এই কাজ করে দেবার জন্য ৫০০০/- টাকা ঘুষ চেয়েছেন। আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরে আমি আমার অঞ্চলের একজন তথ্যকর্মীর সাহায্যে তথ্য অধিকার আইনে সেই পঞ্চায়েত অফিসেই একটি আবেদন করি এবং তাতে জানতে চাই, আমি আমার টাকা পাচ্ছি না কেন? দশ দিনের মধ্যেই আমি সুফল পেয়ে যাই এবং ১৫০০০/- টাকার প্রথম কিস্তি আমার হাতে আসে কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির জন্য আবার সেই একই কর্মকর্তা ঘুষ চায়। আমি এবার নাছোড়বান্দা, ঠিক করি কিছুতেই ঘুষ দেব না। আমি আবার তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করব। এবারও কাজটা সহজেই হয়ে যায়। কর্মকর্তা আইন প্রয়োগের ভয়ে বাকি ১০০০০/- টাকা দিয়ে দেয়।"

জ) "২৭ জন নিরক্ষর মহিলা সরকারের সোয়া দুই কোটি টাকা বাঁচিয়ে দিলেন": চিত্রকুট জেলার ভারথাউল গ্রামের পন্নি নামে এক মহিলা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা সরকারের দেয়া স্কুলের পোশাক (ইউনিফর্ম) ও বই কেন পাচ্ছে না তা বিভিন্নজনকে প্রশ্ন করি। একই কথা জানাই আমাদের অঞ্চলের এক তথ্যকর্মীর কাছে। সে আমার কথা শুনে গ্রামের সবাইকে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে একটা বৈঠক করে। আইনটি সম্পর্কে জেনে আমরা সাতাশ জন মহিলা সেই তথ্যকর্মীর সাহায্যে আমাদের জেলার শিক্ষা অফিসারের কাছে একটি আবেদন পাঠাই। আবেদনের এক মাসের মধ্যেই শুধু আমার গ্রামের ছেলেমেয়েরাই নয় বরং চিত্রকুটের সব সরকারী স্কুলের ছেলেমেয়েরাই সরকারের দেয়া স্কুল ইউনিফর্ম ও বই পেয়ে যায়। এর ফলে সরকারের বরাদ্দ সোয়া দুই কোটি টাকা সদ্ব্যবহার হলো। তথ্য আবেদন না করলে এই টাকা শিক্ষা দপ্তর আত্মসাৎ করত।'

ঝ) **"তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আমার সমস্যার সমাধান" :** আমার নাম রামদাউর। আমি উত্তর প্রদেশের বিলারী গ্রামের অধিবাসী। একদিন আমার পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী আমার বাড়িতে ঢোকার দরজার সামনে তার আত্মীয়-স্বজনের সুবিধার জন্য একটি নর্দমা খনন করে। ফলে আমার বাড়িতে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করেও কোন সহায়তা পাইনি। বরং আমাদের থানার এসআই আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে মারধর করে। আমি কোন রকমে আমার ছেলেকে জামিনে ছাড়িয়ে আনি। আমি তখন আমাদের অঞ্চলের এক তথ্যকর্মীর সাহায্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর অফিসে একটি আরটিআই আবেদন পাঠাই এবং ডিএম-এর কাছে জানতে চাই আমার ছেলেকে কেন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আমার বাড়ির সামনে নর্দমা তৈরী কোন আইনে করা হয়েছে। আমার আবেদন পেয়ে এডিএম ও তার সহকর্মীরা এসে আমার বাড়ির সামনে নর্দমা ভেঙ্গে দিয়ে যায় এবং সেই এসআই-কে সাসপেন্ড করে দেয়। কিভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হলো তা জানতে চাইলে আমি আমার প্রতিবেশীদের আরটিআই-এর ক্ষমতার কথা বলি।"

২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণঃ Freedom of Information (FOI) আইনের মাধ্যমে মার্কিন দেশে অনেক নাগরিক সংস্থা ও এ্যাডভোকেসী গ্রুপ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করে এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে যা আগে জনগণ জানতে পারতো না এবং যা জনগণের কাছে গোপন রাখা হতো। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কোন ওষুধের বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য, আনবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের ত্রুটি বা দুর্ঘটনাজনিত তথ্য যা আশে পাশের লোকজন ও প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে ইত্যাদি। এইসব তথ্যের মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তা বিষয়ে আন্দোলন করে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে এবং জননিরাপত্তার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছে।

৩) **দক্ষিণ আফ্রিকা**র বিরোধী দল তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে সরকারের নথিপত্র দেখার মাধ্যমে নাইজেরিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত একটি তৈল সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত উদঘাটন করে। তার থেকে জানতে পারে যে, এই চুক্তির সুফল জনগণের কাছে না পৌঁছে একটি বিদেশী কোম্পানীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে সরকারকে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা হয়।

৪) জাপানের তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে জানতে পারে যে, "মিনামাতা" (এক রকম বিষাক্ত রাসায়নিক) রোগের বিস্তারের কথা সরকার অন্যায়ভাবে একটি ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ আছে বলে ঘোষণা করে জনগণকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল, যাতে সরকারকে বেশি ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। এটা জানাজানি হবার পর অনেক বেশী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ লাভ করতে সক্ষম হয়।

৫) থাইল্যান্ডের একটি উদাহরণঃ ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে নাথথানিত নামে একটি থাই মেয়ে-শিশু সরকার নিয়ন্ত্রিত 'Katsetsart Demonstration School'

নামে নামকরা প্রাইমারি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। স্বনামধন্য এ স্কুলটিতে ভর্তি হওয়ার আশায় মেয়েটি দীর্ঘ দুই বছর কঠিন পরিশ্রম করে। নাথথানিতকে জানানো হলো, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই তাকে ভর্তি করা যাবে না। মেয়েটির মা স্কুলের রেক্টরের সঙ্গে দেখা করে মেয়েটির পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখতে চাইলে রেক্টর তাতে অস্বীকৃতি জানান।

এরপর থাইল্যান্ডের তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নাথথানিত-এর মা মেয়ের উত্তরপত্র এবং পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর জানানোর আবেদন করেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে সরকারি তথ্য কমিশন এক আদেশে নাথথানিত-এর উত্তরপত্র এবং তার সঙ্গে ভর্তির সুযোগ পাওয়া ১২০ জন শিক্ষার্থীরই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশের আনুষ্ঠানিক হুকুম জারি করেন। আদেশে বলা হয় Katsetsart Demonstration School এর ওই তথ্যগুলো সকলের জানার অধিকার আছে। কিন্তু যে সকল শিক্ষার্থী স্কুলটিতে ভর্তির সুযোগ পেল তাদের বাবা-মা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই তথ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টি করলেন এই অজুহাতে যে, এসব নেহাত ব্যক্তিগত তথ্য, যা সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ১০৯ জনের অভিভাবক এক পর্যায়ে একজোট হয়ে নাথথানিত-এর মায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুন্ন করার দায়ে আদালতে নালিশ জানান। নাথথানিত-এর মা ছিলেন রাষ্ট্রীয় পাবলিক প্রসিকিউটর। আদালতের আর্জিতে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগও তোলা হয়। পরবর্তীকালে নাথথানিত-এর মায়ের পক্ষে আদালতের আদেশ সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ অব্যাহতভাবে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। তারা যুক্তি দেখায়, পরীক্ষার ফল সবার জন্য উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য তাদের কাউন্সিল অব স্টেট, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরো আলোচনার প্রযোজন রয়েছে। তাদের ভাষায়, ভবিষ্যতেও এ রকম অনুরোধ ও আবেদন আসতে পারে বলে আগেভাগেই এর প্রক্রিয়াটি অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

মেয়ের পরীক্ষার নম্বর জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনগত লড়াইয়ের মাঝপথে স্কুল কর্তৃপক্ষ নাথথানিত -এর মাকে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে বলা হয়, তিনি ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শিট দেখতে পারেন, তবে তাতে তার মেয়ে ছাড়া অন্যদের নাম মুছে রাখা হবে। বাস্তবে দেখা গেল, তালিকা অনুসারে স্কুলে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এক তৃতীয়াংশই ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল। নাথথানিত-এর মায়ের সন্দেহ হলো স্কুলটিতে বোধহয় এমনটি ঘটে থাকা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই স্কুলে ভর্তিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি এবং ঘুষের অভিযোগ সংক্রান্ত মুখরোচক গল্প আর কানাঘুষা ছিল সর্বত্রই। যে শিশুদের মা-বাবারা সমাজে উচ্চপদে আসীন, যারা সমাজের এলিট শ্রেণীভুক্ত তারাই উপরোক্ত অনৈতিক সুযোগগুলো গ্রহণ করছিলেন। অভিযোগ ছিল, যে সকল শিশু ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর পেতে পারেনি তাদের ভর্তির ব্যাপারে বাবা-মায়েরা প্রায়ই 'চা খাওয়ার টাকা' দেয়ার নাম করে ঘুষ দেয়া থেকে শুরু করে প্রভাব বিস্তারে সামাজিক পদমর্যাদাকেও নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

অনিয়মের বাস্তব ইঙ্গিত পেয়ে নাথ্থানিত-এর মা পরবর্তী সময়েও তার আইনগত লড়াই চালিয়ে যান। ফলে ২০০০ সালে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট এ সংক্রান্ত এক আদেশে স্কুলটিকে পরীক্ষার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত নম্বরসহ পুরো তালিকা ঘোষণা করার আদেশ দেন। রেকর্ড থেকে জানা যায়, স্কুলটিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর আশাব্যঞ্জক না হলেও তারা ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। এই তথ্য গণমাধ্যমে এবং সাধারণ জনগণের মাঝে গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করে। আর তথ্য অধিকার আইন কাজে লাগিয়ে স্কুলটির ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর বাবা-মায়েরা নিজ সন্তানের পরীক্ষার ফল জানার জন্য ভিড় জমান।

এসময় থাইল্যান্ডের স্টেট কাউন্সিল এক রুল জারি করে যে, দেশের সংবিধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগের যে নিশ্চয়তা দেয়, স্কুলটিতে ভর্তির নীতি সেই অধিকারকে অগ্রাহ্য করেছে। তখন থাইল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রক থেকেও বলা হয়, 'Katsetsart Demonstration School' -এর মতো রাষ্ট্রচালিত স্কুলগুলোকে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। স্টেট কাউন্সিলের রায় ও সরকারি মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তা দেশটির স্কুল ব্যবস্থাপনায় 'স্বজনপ্রীতি এবং গোষ্ঠীতন্ত্র ' খর্ব করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

নাথথানিত-এর মায়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, ব্যক্তিগত ক্ষোভে দাবি করা তথ্য কীভাবে সামগ্রিক নীতি-নির্ধারণে পরিবর্তন এনে বৃহত্তর পটভূমিতে গোটা সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে। নাথথানিত-এর মায়ের অভিযোগ এমন একটি অবিচারকে ঘিরে ছিল, যার বেদনা বইছিল সমাজের অনেকেই। স্কুলে ভর্তির তালিকার মতো মামুলি তথ্য গোপনের যে নজির অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বেরিয়ে আসে তা প্রকৃতপক্ষে এতদিনে জনগণের নজরদারির আড়ালেই ছিল। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নথি বের করার এই নজির অনেককে অনুপ্রাণিত করল মুখ বুজে অন্যায়-অবিচার মেনে নেয়ার রেওয়াজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। তার দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে দেশব্যাপী গুণগত শিক্ষায় সকলের প্রবেশাধিকারের দাবি দানা বেঁধে ওঠে। প্রচার শুরু হয় শিক্ষা শুধু সমাজের বিত্তবান এবং অগ্রসর শ্রেণীর জন্যই নয়, দাবি ওঠে শিক্ষায় সম-অধিকারের।

উপসংহার

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে তথ্য অধিকার আইনের অমিত ক্ষমতার কথা পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এখনো শুরুর পর্যায়ে। গত চার বছরে এ ব্যাপারে যে অগ্রগতি সাধন হয়েছে তা এই বই-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র ও দুর্নীতি দূরীকরণে কিছু সফলতার দৃষ্টান্ত

২০০৯ সালের জুলাই মাস থেকে যখন তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা হয় তখন এটিকে অনেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক একটি আইন বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু প্রায় চার বছর পার হয়ে যাবার পরও তাদের প্রত্যাশা এবং সরকারের প্রতিজ্ঞা কোনটাই তেমনভাবে পূরণ হয় নি তা আইনটির অপ্রতুল ব্যবহার থেকে বোঝা যায় । সারা দেশে তথ্য আবেদন, আপীল এবং অভিযোগের সংখ্যা খুব একটা সন্তোষজনক এমনটি দৃঢ়ভাবে বলা যায় না।

এটা অবশ্যই দু:খজনক যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবি শ্রেণী, বিভিন্ন পেশাজীবি কেউ-ই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্যে তৈরী এই আইনটিকে তেমন করে ব্যবহার করে নি। যে আইন দুর্নীতি দূর করতে এবং সরকারী কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত শক্তিশালী সে আইনটির ব্যবহার এত সামান্য কেন তা অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। যেখানে প্রতিবেশি দেশ ভারতে আইনটি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে সেখানে আমাদের দেশে এর ব্যবহার কেন এত কম তা সবাইকে ভাবতে হবে। অন্যদিকে, সরকার আইনটি প্রণয়ন করেছে ঠিকই কিন্তু একে কার্যকর করতে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে এমনটি জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

তবে কিছু আশার কথাও আছে। সীমিত পরিসরে হলেও দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আইনটি ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। কিছু কিছু বেসরকারি সংগঠন এ কাজে সহায়তা করেছে। তারা কিছু তথ্যকর্মী তৈরী করেছে যারা আইনটির উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনেছে এবং এটিকে নিজের ন্যায্য অধিকার আদায় করা ছাড়াও **সরকারী কাজে** দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কি করে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে অবগত হয়েছে। তারা নিজ নিজ এলাকায় বঞ্চিত শ্রেণী-পেশার লোকজনকে নিয়ে ছোট ছোট দল তৈরী ক'রে তাদের আইনটি সম্পর্কে জানিয়েছে এবং আইনটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে। তবে কিছু কিছু সংগঠন আইনটি ব্যবহার ক'রে সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সচেতন করতে উৎসাহিত করলেও বেশীর ভাগ এনজিওই আইনটি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে।

সাধারণ জনগণ আইনটি ব্যবহার ক'রে এর ডিমান্ড সাইড (জনগণের তথ্য চাওয়ার দিক) যেমন তৈরী করছে তেমনি তার মাধ্যমে সাপ্লাই সাইড অর্থাৎ তথ্য প্রদানকারীদের

দিকটিও তৈরীতে সহায়তা করছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যে ৫-৬ হাজার আবেদন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে এবং যতগুলো অভিযোগ তথ্য কমিশনে করা হয়েছে তার বেশিরভাগই এসেছে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে।

যেহেতু বেশিরভাগ আবেদনকারী সমাজের খুব সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর লোক তাই তাদের আবেদনের বিষয়বস্তুর সিংহভাগই সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচী সংক্রান্ত; দুর্নীতি কমানো বা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সেখানে তেমন প্রাধান্য পায়নি। এ ধরনের আবেদনকে প্রথম প্রজন্মের তথ্য আবেদন বলা যেতে পারে। আশা করা যায় এ পর্যায়ে অর্জিত সফলতা আইনটিকে পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে, যার মূল লক্ষ্য হবে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে যেতে হলে অন্যান্য সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এবং সকল শ্রেণীর জনগণের অংশগ্রহণ যেমন খুব জরুরী তেমনি জরুরী প্রায়োগিক যে সব সমস্যা ধরা পড়েছে তা দূর করা।

উপরে উল্লিখিত বিষয়াদি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ আরো বিশদভাবে তুলে ধরার জন্যেই এখানে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)-এর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কেসস্টাডি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে[১]। বাংলাদেশের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর তথ্য আবেদনের অভিজ্ঞতা থেকে এ কাহিনীগুলো উঠে এসেছে। এইসব জনগোষ্ঠীর সদস্যদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করেছে কিছু এনিমেটর অর্থাৎ উজ্জীবক, যারা রিইব-এর কাছ থেকে আইনটি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। তারা গণগবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে যেসব বিষয়, তা নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা করেছে। আলোচনার পর জনগণই সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার ক'রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করবে।

উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায় যে অনেকগুলো সমস্যার কারণে তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া ও আইনটির প্রসার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এগুলো দূর করা গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১. তথ্য আবেদন পত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও তার পদবী উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা।
২. অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকা ও বদলী হওয়ার কারণে তাদের নাম না পাওয়া।
৩. সরকারি কর্মকর্তাদের আইনটি সম্পর্কে না জানা এবং আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত না হওয়া।

---

১. রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) - এর তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ ও প্রকাশনা সম্পর্কে জানতে www.rib-rtibangladesh.org এই ওয়েবসাইটটি দ্রষ্টব্য।

৪. জনগণের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক আচরণ।
৫. অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের আমলাতান্ত্রিক আচরণ।
৬. অভিযোগ শুনানীতে কমিশনের নিয়মের কড়াকড়ি এবং কঠিন ব্যবহারে সাধারণ আবেদনকারীর মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া।
৭. ঢাকার বাইরে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে অভিযোগের শুনানিতে অংশ নেওয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়া।

সরকার ও তথ্য কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। এখানে বর্ণিত কেসস্টাডিগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, আইন প্রয়োগে সকল শ্রেণীর জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে আইনটি ততই কার্যকর হবে। তথ্য চাওয়ার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাবে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্টরা ততটা সচেতন হবেন।

যে কোন ক্ষেত্রেই সফলতার সূচনা বিষয়কে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দেয়। বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে কিছু সফলতার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে যারা এটি চর্চা করেছে। এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

১. পুলিশও তথ্য দিতে বাধ্য।

তথ্য অধিকার আইন-এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে সৈয়দপুর উপজেলায় গঠিত গণগবেষণা দলের সাপ্তাহিক সভায় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশের টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গটি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। তখন অনেকের ধারণা ছিল- থানায় অভিযোগ করতে গেলে কোন টাকা লাগে না। কিন্তু বাস্তবে টাকা না দিলে থানায় কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না বলে সেদিন কেউ কেউ আলোচনায় জানানোর পর উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য জানার জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২ জুলাই ২০১১ তারিখে সৈয়দপুর উপজেলার তাহেরা বেগম এলাকার তথ্য অধিকার কর্মী কামরুন নাহার ইরা'র সহায়তায় একটি আবেদপত্র লিখে সৈয়দপুর থানায় পাঠিয়ে দেন। তিনি যে তথ্য পেতে আবেদন করেছিলেন তা ছিল এরকম : "জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত কতজন নির্যাতিত নারী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল তাদের নামের তালিকার কপি পেতে চাই।" থানায় গেলে প্রথমে ডিউটি অফিসার আবেদনটি গ্রহণ করতে অপারগতা জানান। কামরুন নাহার ইরা তখনই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে দেন। আইনটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভের পর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র না দিয়েই অফিসার আবেদনটি গ্রহণ করেন। আর সন্ধ্যার পর স্যার (ওসি) অফিসে আসলে তখন আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র দেওয়া হবে বলে কামরুন নাহার ইরা'কে আশ্বাস দেয়া হয়। ডিউটি অফিসারের কথা অনুযায়ী সেদিন সন্ধ্যায় কামরুন

নাহার ইরা আবারো থানায় গেলে তখন আবেদনটি আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁকে জানানো হয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে গত ৩০ জুলাই ২০১১ তারিখে আবেদনটি থানায় পাঠিয়ে দেন। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে গত ৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তাহেরা বেগম রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আপীল করেন। সেখান থেকেও কোন জবাব না আসায় গত ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ পাঠিয়ে দেন।

তাহেরা বেগম এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সৈয়দপুর থানার দারোগা ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জামালউদ্দিনকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। এলাকায় তাহেরা বেগম- এর এই তথ্য আবেদনের বিষয়টি জানাজানি হলে তা নিয়ে প্রথম আলো পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন (৯/১/২০১২) প্রকাশিত হয়। তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানি অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলা সহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়।

এই তথ্য আবেদনের ফলে জনগণের সামনে এটা এখন পরিস্কার হয়ে উঠছে যে, এদেশের জনগণের কাছে থানা পুলিশ সাধারণত একটা ভয়ের জায়গা হওয়ার কারণে সেখানে গৃহিনীরা/নারীরা তো বটেই, সাধারণ জনগণও সাধারণত যেতে চান না। বলতে গেলে খুব একটা প্রয়োজন দেখা না দিলে সেখানে কেউই যান না। এই আবেদন এখন জনগণের মনে সাহস যোগাচ্ছে। জনগণকে নানান অফিসে তথ্য আবেদন করতে উৎসাহ দিচ্ছে। কারণ জনগণ এখন বুঝতে পারছেন যে, তথ্য অধিকার আইন এমন একটা শক্তিশালী আইন, যা তাহেরা বেগম এর মত একজন সাধারণ গৃহিনীকে থানা পুলিশের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য লাভের সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই জনগণ মনে করছেন, থানা পুলিশকে যদি এভাবে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হয় তাহলে অন্যদেরও অতি সহজেই তথ্য প্রদানে বাধ্য করা সম্ভব। তথ্য জানার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের কাজের নজরদারি করা সম্ভব। তথ্যকর্মী তাহেরা বেগম ও কামরুন নাহার ইরা'দের এভাবে ঢাকায় এসে শুনানিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য লাভের ঘটনা এক অর্থে নারীর ক্ষমতায়নেরই দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

২ . খাগড়াছড়িতে তথ্য লাভের মাধ্যমে বাজারের টোল আদায় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও অনিয়ম রোধে সফলতা অর্জন

মিলন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খবংপড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাজার করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই বিক্রেতাদের কাছে টোল সংগ্রহে অনিয়মের বিষয়ে নানা কথা শুনতে পান। প্রায় সকল বিক্রেতার মধ্যেই এই টোল আদায় নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে কিন্তু তারা কেউই

কিছু বলতে পারেন না। আসলে তারা জানেন না যে কোথায় কি বলতে হবে বা কাকে কি বলতে হবে। তিনি মনে করেন যে বিষয়য়টির সাথে দুর্নীতি যেমন জড়িত তেমনি জনগণের নাগরিক অধিকার লংঘনের বিষয়ও রয়েছে। এর সঙ্গে নাগরিকের সঠিক তথ্য না জানার বিষয়টিও যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে টোল আদায়ে অনিয়ম হয় তা প্রতিরোধের জন্য গত ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমা বাজার ফান্ড কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের বিষয় ছিল- বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিসের উপর কি ধরনের টোল আদায়ের পরিমাণ ধার্য্য করা আছে তার নিয়মাবলী জানা। আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন জবাব না দিলে পরে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ির চেয়ারম্যান বরাবরে আপীল করা হয়। এরপর চেয়ারম্যান তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিলে উক্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হন।

আবেদনের তথ্য লাভের পর সেটা নিয়ে গণগবেষণা দলের সভায় বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হয়। তাতে টোল আদায়ে যে অনিয়ম করা হয় সে বিষয়টি ধরা পড়ে। তাই এই বিষয়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা প্রাপ্ত তথ্যটি প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে উক্ত তথ্যের ফটোকপি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে এনিমেটর রিপন চাকমা গণগবেষণা দলের অপর সদস্য বিদর্শন চাকমা-কে সাথে নিয়ে হলুদ এবং চাউলের বাজার পরিদর্শনে যান।

বাজারে তারা টোল আদায়কারীকে দর কষাকষি করতে স্বচক্ষে দেখতে পান। নিজের হলুদ বিক্রির পর বিক্রেতা তাদেরকে জানান, "আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা চাঁদা (টোল) চায়"। লোকটির হলুদের ওজন হয়েছিল ১ মন ১৯ কেজি। প্রাপ্ত তথ্যের হিসাব মোতাবেক তার ২২ টাকা চাঁদা (টোল) দেবার কথা। রিপন চাকমা কিভাবে টাকা দিতে হবে তা টোল আদায়কারীর কাছে জিজ্ঞেস করেন। টোল আদায়কারী পাঁকা হলুদ ও কাঁচা হলুদের মধ্যে জট পাকিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তখন রিপন তাকে তালিকাটি দেখিয়ে বলে, "ভাই, বিক্রেতাকে তো হিসেব মোতাবেক ২২ টাকা দিতে হয় আপনি কেন ৫০ টাকা চাচ্ছেন?" টোল আদায়কারী তালিকাটি পেয়ে অবাক হয় এবং হিসাবে ভুল হয়েছে বলে দু:খ প্রকাশ করে ২০ টাকা নিয়ে চলে যান। এ সময় রিপন ও বিদর্শন বিক্রেতাদের মধ্যে টোল আদায়ের নিয়মাবলীর তালিকাটি আরো বেশি করে বিতরণ করেন এবং কোনভাবেই যাতে টোল আদায়কারীকে বেশি টাকা না দেয়া হয় সেই বিষয়ে সচেতন করেন।

বিক্রেতারা তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানান "ভাই, খুব ভাল হয়েছে। তালিকাটি দিয়ে আজকে আমরা ২ মণ হলুদ-এর টোল হিসাবে ৩০/- টাকা দিয়ে রেহাই পেয়েছি। এই

ব্যাপারটি আমরা এলাকায় গিয়ে জানাবো এবং তালিকাটির ফটোকপি সবাইকে ভাগ করে দেবো"। এরপর চাউলের বাজারে মনিটরিং করতে গেলে সেখানেও অতিরিক্ত টোল আদায় করার অনিয়ম ধরা পড়ে। যেখানে ৫ টাকা দেওয়ার নিয়ম সেখানে ১০ টাকা নেওয়ার বিষয়টি তারা প্রত্যক্ষ করেন। তাদের মাঝেও রিপন ও বিদর্শন তালিকার কপি প্রদান করেন এবং কিছু লিখিত রশিদ সংগ্রহ করেন। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তারা এক পর্যায়ে বাজার ফান্ড কার্যালয়ে গিয়ে অনিয়মের কথা জানিয়ে দেন। তখন সেখান থেকে তাদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে অভিযোগ না আসলে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তারা সাধারণ মানুষ হিসেবে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাজার ফান্ড কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তথ্যটি এভাবে জনসমক্ষে প্রচারের ফলে বাজার ফান্ড কর্তৃপক্ষের টোল আদায়ের অনিয়মের বিষয়টি এলাকার সকলে জানতে শুরু করে । এতে সংশ্লিষ্ট সকলেই সতর্ক হয়। অনেক বিক্রেতা অতিরিক্ত টোল প্রদান থেকে রেহাই পায়। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত তথ্যটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। কারণ বাজারে যারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি করে থাকেন তারা সাধারণত সকলেই দরিদ্র শ্রেণীর। এই তথ্য জানার ফলে তারা টোল আদায়ের নামে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। আশা করা যায়, এর ফলে যদি ভবিষ্যতে জনগণ আরো বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেন তাহলে টোল আদায়ের নামে বাজার ফান্ডের দীর্ঘদিনের অনিয়ম চিরতরে বন্ধ হবে। এই সকল কারণে তথ্য আবেদনের এই কাজটি এলাকায় খুবই প্রশংসিত হয়েছে বলে জানা গেছে। গণগবেষণা সভায় বিষয়টি নিয়ে বাজারে মাইকিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩. তথ্য আবেদনের মাধ্যমে প্রশিকার সাবেক কর্মী শিক্ষক দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ লাভ।

দয়াময় চাকমা ৮ বছর চাকুরী করার পর প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বিধি মোতাবেক পদত্যাগ করেন ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। চাকুরীকালীণ সময়ে বেতন থেকে বেসিক ১০% কেটে রাখা হতো, এছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি মিলে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে তার সর্বমোট পাওনার পরিমাণ ছিল ১,৫০,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা)। উক্ত পাওনা টাকা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করার কথা জানানো হয়েছিল। যথাসময়ে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয়েছিল যে, নির্ধারিত তারিখে টাকাগুলো প্রদান করা যাচ্ছে না, কখন দেওয়া যাবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। হাল ছেড়ে না দিয়ে অনেক যোগাযোগ করে দয়াময় প্রথম কিস্তি হিসেবে মাত্র ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) লাভে সমর্থ হন। পরবর্তীতে অবশিষ্ট টাকাগুলো কখন বা কত তারিখে দেওয়া হবে তার কিছুই প্রশিকা'র হেড অফিস থেকে জানানো হয়নি। তাই হতাশ হয়ে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে অবশিষ্ট পাওনা টাকাগুলো হয়তো আর কখনো পাওয়া যাবে না।

এরইমধ্যে পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ২০১২ সালের শুরুতে দয়াময় এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, প্রশিকার অপর একজন প্রাক্তন কর্মী তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করার মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ পাওনা লাভে সমর্থ হয়েছেন। এরপরই তিনি রিইব-এর তথ্য অধিকার কর্মী রিপন চাকমার সহায়তায় তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমে প্রশিকা হেড অফিসে তথ্য আবেদনের চিঠি পাঠান। তাঁর তথ্য আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু ছিল : প্রশিকার কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার নীতিমালা এবং যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রশিকার সাবেক কর্মী দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে সেই সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পদবী সহ নামের তালিকার কপি পাওয়ার জন্য আবেদন।

আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রশিকা কর্তৃপক্ষ চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে। কিন্তু তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় দ্বিতীয় দফায় আইন অনুযায়ী আপীল করেন দয়াময় চাকমা। প্রশিকা কর্তৃপক্ষ আপীল পাওয়ার পর তার সাথে যোগাযোগ করে এবং অবশিষ্ট পাওনা বাবদ ১,২৫,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা) টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনুরোধ করে। সে অনুযায়ী ঢাকায় এসে চেক এর মাধ্যমে তার সমুদয় পাওনা টাকা গ্রহণ করেন দয়াময়। যে টাকা পাওয়ার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন, তা দুটি আবেদনের মাধ্যমে ফিরে পেয়ে তিনি অভিভূত হয়ে যান এবং ভাবেন তথ্য অধিকার আইন এমনই একটি আইন যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি তো ধরা পড়বেই, সাথে সাথে জনগণও তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারে।

৪. কৃষি ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস

মো. সউদ খান একজন বেদে সম্প্রদায়ের সদস্য এবং কৃষক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পদ্মার চরে চাষাবাদ করেন। অভাবের কারণে বীজ, চারা, কীটনাশক ইত্যাদি যোগাড় করতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। আর কোনোমতে যদি এসবের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর এক বিপদ এসে দেখা দেয়, যার নাম প্রকৃতিক দুর্যোগ। প্রায় প্রতি বছরই ফসল উৎপাদনে এমন সমস্যায় পড়তে হয়। এর প্রতিকারের আশায় মেম্বার-চেয়ারম্যান-ব্লক সুপারভাইজারদের কাছে গেলে তারা আশ্বাস দেয় যে বরাদ্দ আসলে তা দেওয়া হবে। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের নামের তালিকা ও ঠিকানা নিয়ে যাওয়া হয়। তাই আর সবার মতো সউদ খানও আশায় থাকেন এই বুঝি সরকারী বরাদ্দ আসে আর সেখান থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু সাহয্য পাওয়া তো দূরের কথা প্রতিবার ঐ নাম-ঠিকানা নেওয়ার পরে আর কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। হতাশ হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আর কখনো নাম তালিকাভুক্ত করবেন না। ২০১০ সালে তিনি একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের জন্য সরকারী কৃষিকার্ড এর কথা জানতে পারেন। এলাকার অনেকে এখানে নাম তালিকাভুক্ত করতে পারলেও বেদে হওয়ার

কারণে প্রথমে তিনি বাদ পড়েন। পরবর্তীতে একদিন তিনি কৃষিকার্ড প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও নিয়মাবলীর কপি চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এরপরে সেখান থেকে তাকে ডেকে কিভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তার নিয়মাবলী শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর কিছুদিন পরে সউদ খান খোঁজ নিয়ে দেখেন যে তার নামে ৮০০ টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সাথে সাথেই তাকে সেই টাকা প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

৫. তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রবিদাস সম্প্রদায়ের বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তি

১৯৯৭ সালে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম শুরু করে সরকারী সেবামূলক কর্মসূচীর অধীনে যাতে দরিদ্র শ্রেণীর বয়স্ক ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬২ এবং তদুর্ধ্ব বয়সী দরিদ্র ব্যক্তিদের মাসে ৩০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার রবিদাস সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিরা এই সেবা হতে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যতবারই এ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে ততবারই শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। মুন্না দাস, যিনি রবিদাস সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ও রিইব প্রশিক্ষিত তথ্যকর্মী তিনি তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য জানতে আগ্রহী হন যে, কারা বয়স্ক ভাতা পাবার যোগ্য, এই সুবিধা পাওয়ার শর্ত কি এবং কারা এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ।

মুন্না দাস সৈয়দপুর উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে তার এলাকার বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং বয়স্ক ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলীর কপি পেতে চান। আবেদনপত্র জমা দেয়ার পরে তিনি সৈয়দপুর উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তার অফিসে যান। সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন তিনি তালিকা প্রদান করতে পারবেন না, কিন্তু যারা বয়স্ক ভাতা পেতে পারেন এমন ব্যক্তিদের কোন ছবিসহ তালিকা যদি মুন্না দাস দেন, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে অনুযায়ী মুন্না পাঁচ জনের নামের তালিকা প্রদান করেন যাদেরকে পরবর্তীতে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপরে তারা প্রত্যেকে ৩৬০০ করে টাকা পান। মুন্না দাস মনে করেন খুব সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জনগণ- যারা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

৬. হাসপাতাল থেকে রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার অবসান

উত্তরবঙ্গের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় অবস্থিত ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয় বলে লোকের মুখে ইতিপূর্বে শুনেছেন এলাকার আলেয়া বেগম। সেই ভরসায় তিনি ঔষধ কেনার সামর্থ্য

নেই এমন এক দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা লাভের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত ব্যক্তি ঔষধ নেই বলে তাদের ফিরিয়ে দেন। সেই দিন তিনি বাধ্য হয়ে শেষ-মেষ বাইরে থেকে চাঁদা তুলে উক্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য ঔষধ কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি গণগবেষণা দলের সাপ্তাহিক সভায় বিষয়টি আলোচনা করার জন্য উত্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে এই ঘটনা জানার পর এক আলোচক বিষয়টি নিয়ে তথ্য আবেদন করার প্রস্তাব করেন। সরকারীভাবে হাসপাতালে কি কি ঔষধ সরবরাহ করা হয় এবং সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা সকলের জানা উচিত বলে সবাই মন্তব্য করেন। 'গত মাসে সৈয়দপুর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে কি কি ঔষধ সরকারীভাবে এসেছে এবং সেগুলো কাদের দেয়া হয়েছে' - তা নিয়ে আলেয়া বেগম একটি তথ্য আবেদন করবেন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তারই সূত্র ধরে আলেয়া বেগম ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে রিইব এনিমেটর কামরুন নাহার ইরা'র সহায়তায় হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ডাক্তার) কাছে আবেদন করেন। আবেদন জমা দিতে গিয়ে সেদিন আলেয়া'কে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। এর কিছু দিন পর হাসপাতাল থেকে আলেয়া'কে ফোনে ডাকা হয়। সে অনুযায়ী তিনি হাসপাতালে গেলে তারা আলেয়া'কে যথেষ্ট সম্মান করে বসতে দেন এবং ডাক্তার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নামাজে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। ডাক্তার ফিরে এসে আলেয়া'র কাছ থেকে তথ্য আবেদনের বিষয়টি নিয়ে জানার চেষ্টা করেন। বিষয়টি তাকে বিস্তারিতভাবে জানানোর পর তিনি আলেয়া'র কথায় খুব খুশী হন এবং আবেদনের সব তথ্য প্রদান করেন। শেষে তিনি আলেয়া'কে আশ্বস্ত করে বলেন, "এর পর থেকে রোগী নিয়ে আসলে হাসপাতালে ঔষধ থাকা সাপেক্ষে আপনার রোগী অবশ্যই সব ধরনের ঔষধ সহায়তা পাবে"।

আবেদনের মাধ্যমে তথ্য লাভের পর আলেয়া বেগম দলের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় সেগুলো সকলকে জানিয়ে দেন। এর ফলে হাসপাতালে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে কি কি ঔষধ সরবরাহ করা হয় তা সকলেই জানতে পারেন। বিষয়টি এলাকার সকলে যাতে জানতে পারে তা সকলকে জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৭. খাগড়াছড়িতে জনৈক প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের ঘটনার অবসান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষকদের দ্বারা অর্থ আদায়ের ঘটনা প্রায়শই শোনা যায়। বিষয়টি স্থানীয় তথ্য অধিকার কর্মীদের আমলে এলে এ ব্যাপারে কি করা উচিত তা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। তখন এই অনিয়মের বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দৃষ্টিগোচর করা দরকার বলে তারা মত প্রকাশ করেন। তারপর একদিন উপজেলা শিক্ষা অফিসে তথ্য আবেদন জমা দিতে গেলে এই ধরনের অনিয়মের বিষয় নিয়ে উপজেলা

প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের লোকজনের সাথে খাগড়াছড়ির তথ্য অধিকার কর্মী রিপন, মিলন-এর সাথে আলোচনা হয়। তখন শিক্ষা অফিসের লোকজন বিষয়টি দেখবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করেন।

গত ২৫/০১/২০১২ তারিখে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক নেটওর্য়াকিং সভার আয়োজন করে। সেই সভায় উপজেলা শিক্ষা অফিস, আলো, জাবারাং মহিলা কল্যাণ সমিতি, তৃণমূল, ব্র্যাক, আনন্দ ও পাড়া- ট্রাস্ট সহ প্রভৃতি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সভায় তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (খাগড়াছড়ি সদর) জানান, তিনি তার অধীনস্থ এক প্রধান শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা ফি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফেরত দিতে বলেন। এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকও ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফি বাবদ অতিরিক্ত নেওয়া অর্থ (সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদানের সময় প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা হারে নেওয়া হয়) ফেরত দিতে রাজি হন। তিনি আরো জানান, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এখন যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে যে কোন সময় এই অনিয়মের বিষয়টি নিয়ে তথ্য আবেদন হতে পারে। তখন এই অনিয়মের বিষয়টি ধরা পড়লে নিজের এবং প্রধান শিক্ষকের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই সে ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানান। তিনি মনে করেন, তথ্য আবেদন করার কারণে এখন সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরী হতে শুরু করেছে। এখন সবাই সজাগ হচ্ছে। যার ফল দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ থাকবে বলে আশা করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য আবেদন করার কারণে সরকারী অফিসে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন।

৮. তথ্য আবেদনের পর বাড়ীতে জবাব প্রেরণ

গরু-ছাগলের চিকিৎসার জন্য সরকারি পশু পালন কর্মকর্তারা কোন প্রকার ফি এবং ওষধের দাম নিতে পারেন কিনা ? গত ২০১০-২০১২ অর্থবছরে সৈয়দপুর উপজেলায় মোট কতটি গরু -ছাগলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে ? উক্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে সরকারিভাবে কত টাকা আয় ও ব্যয় হয়েছে? এবং একই অর্থবছরসমূহে (২০১০-২০১২) সৈয়দপুর উপজেলায় পশু চিকিৎসা বাবদ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কি কি ঔষধ বরাদ্দ এসেছে তার তালিকার কপি পাওয়ার জন্য রাজু দাস নামে স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের এক মুচি গত ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে আবেদন করেন। আবেদনটি রেজিষ্টার ডাকযোগে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার অফিসে পাঠানো হয়। আবেদন পাঠানোর ১৮ দিন পর উক্ত অফিসের একজন বাড়ীর সামনের দোকানে মুন্না ও রাজুদাস'কে চেনেন কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। তখন দোকানদার কি হয়েছে তা জানতে চাইলে উক্ত কর্মকর্তা তাদের আবেদন করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তখন দোকানদার

মুন্না দাস'কে ডেকে দেন। মুন্না দাস আসলে তিনি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয় হতে তার আগমনের কথা জানান এবং তথ্য প্রদানের বিপরীতে তাকে মূল্য পরিশোধ করার কথা জানিয়ে দেন। তখন মুন্না দাস বলেন, আপনি তো মোবাইলে এই বিষয়টি জানাতে পারতেন। এর জবাবে উক্ত কর্মকর্তা মোবাইল করার জন্য সরকার তাদের কোন বিল দেয়না বলে জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আপনাদের তথ্য আবেদনের জবাব নিয়ে এসেছি স্বাক্ষর করে নেন। এরপর রাজু দাস'কেও তথ্য গ্রহণের জন্য ডাকতে বলেন। তখন রাজু দাস'কে স্কুল থেকে ডেকে এনে আবেদনের জবাব প্রদান করা হয়। তখন উপস্থিত সকলের মাঝে উক্ত কর্মকতা বলেন আমাদের অনেক কাজ ছেড়ে আপনাদের বাড়ি আসতে হয়েছে। পরবর্তীতে এলাকার লোকজন ভালভাবে বুঝতে পারছে যে, এক সময় সরকারি অফিসে রবিদাসদের ঢুকতে দেয়া না হলেও এখন বাড়িতে এসে তারা আবেদনের তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছে।

৯. খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়ম ও রোগীদের নানা ভোগান্তিজনিত সমস্যার সমাধান

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়মের কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আরটিআই প্রকল্প, রিইব ও পাড়া ট্রাস্ট, খাগড়াছড়ির গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমা বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রায়ই ভাবতেন বলে জানান। আরটিআই প্রকল্পের একজন সদস্য হিসেবে একদিন দলীয় আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে আবেদন করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সে অনুযায়ী মিলন চাকমা গত ২৭ জুন ২০১১ তারিখে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আরএমও'র কাছে তথ্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের বিষয় ছিল:

১। বর্তমানে হাসপাতালে কি কি ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয় তার তালিকা এবং

২। এম.আর, ডেলিভারীর বিনিময়ে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হয় কিনা তার নির্দেশনা থাকলে সেই নির্দেশনার কপি পেতে চান

মিলন চাকমা'র আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর, হাসপাতালের আরএমও তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী পরের দিন মিলন চাকমা'র সাথে দলীয় এনিমেটর রিপন চাকমাও আরএমওর সাথে দেখা করতে যান। আইনটি সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে আবেদনটি পেয়ে আরএমও প্রথমে ভেবেছিলেন যে, সেবা নিতে গিয়ে কোন ডাক্তারের সাথে মিলন চাকমা'র ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার কারণে আবেদনটি করা হয়েছে। তাই সাক্ষাতের প্রথমেই তিনি মিলন চাকমা'র কাছে কোন ধরনের ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কিনা তা জেনে নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে মিলন চাকমা আরএমওকে তাঁর আবেদনের বিষয়টি বিস্তারিত অবগত করেন। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আরএমও খুব খুশি হন এবং এই তথ্যগুলো গরীব জনগণের খুব উপকারে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যে আরএমও মিলন চাকমা'কে সব তথ্য প্রদান করেন।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে মিলন চাকমা'রা অনেকটা হতবাক হয়ে যান, যখন দেখতে পান যে, সরকারীভাবে বর্তমানে হাসপাতালে ৭৭ ধরণের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। যদিও হাসপাতালে আসা রোগীদের এসকল ঔষধ সাধারণত দেয়া হয় না। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের প্রায় সময়েই বাইরের ফার্মেসী থেকে এ সকল ঔষধ কিনতে হতো বলে অভিযোগ শোনা যায়। অন্যদিকে হাসপাতালে বিনামূল্যে এম.আর এবং ডেলিভারি সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও মিলন চাকমা'রা জানতে পারেন। তাই তাঁরা নিজেদের আলোচনা সভায় উল্লেখিত তথ্য জনগণের কাছে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং সে অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যগুলো ফটোকপি করে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন, যেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাসপাতালে সরকারীভাবে রোগীদের বিনামূল্যে প্রদত্ত ঔষধ ও সেবা সর্ম্পকে সবাইকে সচেতন করে তোলা। হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রদত্ত সেবা গ্রহণে এবং প্রদানে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহী করে তোলা। এ লক্ষ্যে এলাকার নানা ক্লাবে গিয়ে জনগণের সাথে মিটিং করা হচ্ছে। এ সকল তথ্য লাভের বিষয়টি প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এখন হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। আর ডেলিভরীর জন্য কোন টাকা নেওয়া হচ্ছে না। আগে এই দু'টো বিষয়ে অনিয়ম থাকলেও বর্তমানে সেগুলো অনেকটা কমে গেছে বলে সংশ্লিষ্টদের বয়ানে জানা যায়। এপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগী জ্যাকশন চাকমা'র পিতা লক্ষীবাহন চাকমা জানান, "এক সময় হাসপাতালে তেমন কোন ঔষধ পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। এটা আমাদের মত গরীব লোকদের জন্য খুবই উপকারে লাগছে"। এনিমেটর রিপন চাকমা জানান, "তথ্য চাওয়ার ফলে একদিকে যেমন ডাক্তারের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গরীব মানুষকেও সহযোগিতা প্রদানে সুবিধা হচ্ছে"।

১০. ভূমিহীনদের খাসজমি লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সুরাহা

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় বসবাসরত রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে অনেক ভূমিহীন পরিবার রয়েছে। অন্য অনেকের মত তাঁদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন- সরকারী খাস জমির বন্দোবস্ত পাওয়া। অথচ এখনো পর্যন্ত তাঁদের কারোর কপালে সেই সৌভাগ্য জোটেনি। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য জানার জন্য রিইবের গণগবেষণা দলের সদস্য মিঠুন দাস এলাকার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের বিষয় ছিল- ৫নং খাতামধুপুর ইউনিয়নে কয়টি মৌজা আছে এবং ৮নং রেজিস্টারের ১নং খতিয়ানে রাস্তা এবং বরাদ্দকৃত জমি বাদ দিয়ে বর্তমানে খাতামধুপুর ইউনিয়নে কোন মৌজায় কতগুলো খাস জমি আছে সেগুলোর রেকর্ডের কপি সংগ্রহ করা।

মিঠুনদাস ১৭/০৭/২০১১ তারিখে ডাকযোগে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সৈয়দপুর, নীলফামারী অফিসে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করেন। আবেদন পাঠানোর তিন দিন পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফোন করে মিঠুন দাস এর পরিচয় জানতে চান। তারপর তিনি একটু ধমক দিয়ে বলেন, "আপনি কি বেশি আইন জানেন"? এর জবাবে মিঠুন দাস তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং সে আইনের বলে তথ্য আবেদন করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেন। এক পর্যায়ে উক্ত কর্মকর্তা মিঠুন দাস'কে মানহানি মামলা করার হুমকি দেন। মিঠুন দাস তখন উক্ত কর্মকর্তাকে সব কিছু মোবাইলে রেকর্ড করার কথা বলেন। এই কথা শুনামাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গে ফোন বন্ধ করে দেন। আবেদন প্রদানের ২০ কার্যদিবসের দিনে মিঠুন দাস এর নামে সৈয়দপুর উপজেলা ভূমি অফিস থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, মিঠুন দাস, আপনাকে আগামী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের উল্লেখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য ৭.০০ টাকা ফি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। তথ্য অধিকার কর্মী মুন্না দাস'কে সাথে নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার সময় মিঠুন দাস সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যান । সেখানে কর্মরত এক অফিস সহকারীকে বিয়টি অবগত করে কোথায় টাকা জমা করবেন তা জানতে চান। তিনি তখন তাঁর স্যারের (সহকারী কমিশনার, ভূমি) সাথে কথা বলতে পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী আলাপ করতে গেলে উক্ত কর্মকর্তা দায়সারাভাবে বলেন, সেটা আপনি জানেন। তখন একই আইনের বিধিমালায় নির্ধারিত এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য প্রদানের কথা উল্লেখ থাকার বিষয়টি আমলে আনা হয়। তারপরও তিনি বলেন যে, আপনি কোথায় দেবেন সেটা আপনি জানেন। এভাবে আলোচনার একপর্যায়ে রেভিন্যু স্টাম্পের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করা হয়। সেদিনই আবেদনের যাবতীয় তথ্য ফটোকপি আকারে প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য আবেদনের ফলে সরকারী অফিসের লোকজনও এখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে, এখন থেকে আবেদনকারীদের আর হুমকি বা ধমক দিয়ে কোন ভাবেই থামিয়ে রাখা যাবে না। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত তথ্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রদান করা এখন বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে একটু একটু করে হলেও সমাজের লোকজন বুঝতে পারছেন যে, এই আইনের কারণে বাস্তবে তাঁরা এখন অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।

১১. শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দূর্নীতি হ্রাস

পার্বত্য জেলা পরিষদে শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম চলে আসছিল। জনশ্রুতি আছে যে, প্রত্যেক শিক্ষক নিয়োগে ৪/৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেয়া হয়। লোকজনও এই অনিয়ম বা দূর্নীতিকে মেনে নিয়েছে। এরূপ দুর্নীতিরোধ কল্পে তথ্য কর্মী রিপন চাকমা স্ব-

উদ্যোগে ২৯/৮/২০১১ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য আবেদন করেন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা এবং ২০১১ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম, নিয়োগ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও পরীক্ষা খাতাসমূহ দেখার জন্য আবেদন করেন তিনি।

বিষয়টির সাথে যেহেতু দুর্নীতি জড়িত ছিল তাই পরিষদ থেকে রিপন চাকমা'কে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি প্রস্তাবে রাজি না হলে তারা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। অসম্পূর্ণ তথ্য পেয়ে রিপন চাকমা আপীল করতে বাধ্য হন। আপীল কর্মকর্তা অর্থাৎ পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ির চেয়ারম্যান তাকে রেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিনীত অনুরোধ করেন তথ্য না চাওয়ার জন্য। এতেও কাজ না হলে এলাকার গণ্যমান্য লোক দিয়ে রিপন চাকমাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়। এক সময় রিপন চাকমা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারেন যে, তিনি সমঝোতায় না গেলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন।

পরবর্তীতে তাদের চাপ, অনুরোধ, হুমকি ইত্যাদি অব্যাহত থাকলেও রিপন চাকমা ঐসব তোয়াক্কা না করাতে তারা তথ্য না দিলেও শিক্ষকদের নাম, প্রাপ্ত নম্বর এবং খাতাসমূহ দেখান। তখন তারা এও স্বীকার করেন যে, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। তখন তারা ভবিষ্যতে ঐরকম আর হবে না বলে ব্যাপারটি বাইরে/ জনসম্মুখে প্রচার না করতে রিপন চাকমা'কে করজোড়ে অনুরোধ করেন।

আবেদন করার পর থেকে প্রকাশ্যে দূর্নীতি, অনিয়ম অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে এই ধরনের অনিয়মের ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘটলেও কারোর কিছু করার ছিল না। এই সব দেখে এলাকার লোকজন বলাবলি করতে শুরু করেছে যে, একটা তথ্য আবেদনেই জেলা পরিষদের কর্তাব্যক্তিদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এটা এলাকার অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে বলে লোকজনের মুখে মুখে প্রচার হচ্ছে। রিপন চাকমা'র তথ্য আবেদনের এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রভাবশালী মানুষদের হুমকি-ধমকি, চাপ, অনুরোধ ইত্যাদি তোয়াক্কা না করে যদি সৎ সাহসের সাথে তথ্য আবেদন করা যায় তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগসহ সব ক্ষেত্রে দূর্নীতি ও অনিয়ম ধীরে ধীরে কমে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনতা ব্যাংক শাখায় সেবা প্রদানে কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের হয়রানির অবসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি জনতা ব্যাংক শাখার 'লাঞ্চ টাইম' এ অতিরিক্ত সময় ব্যয় এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে গাফিলতি ও অনিয়মের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল। সমস্যাটি প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বপালনের নিয়মাবলীর সঠিক তথ্য জানার লক্ষ্যে গণগবেষণা দলের সভায় তথ্য আবেদন করার বিষয়টি নির্ধারিত হয়। তার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যায়ন বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য পাওয়ার জন্য গত ১ জুন ২০১১ তারিখে আবেদন করেন।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণের নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করবার বিধান আছে। সে অনুযায়ী অপেক্ষা করেও কোন তথ্য না পাওয়ার কারণে সরাসরি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে বিষয়টি নিয়ে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দলের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আলোচনা করতে যান। এ প্রেক্ষিতে তাঁকে হেড অফিস এই তথ্য প্রদান করবে বলে সেদিন জানানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত ৩০ কার্যদিবসের মধ্যেও তথ্য না পাওয়ার কারণে গত ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখে তিনি আইন অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। সেখান থেকে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি গত ৮ আগস্ট ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার কয়েকদিন পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনেকটা দায় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তথ্য কমিশন অভিযোগ আমলে নিয়ে গত ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে শুনানির জন্য সমন জারি করলে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। সে অনুযায়ী উভয় পক্ষ শুনানিতে অংশগ্রহণ করে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করে। তথ্য কমিশনারগণ বিষয়গুলো আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে আবেদনকৃত তথ্যসহ ২১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পরবর্তী শুনানিতে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত শুনানিতে আবারো সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কমিশনারগণ তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করলে তিনি আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করেন।

তথ্য প্রদানে বাধ্য হওয়ার পর থেকে জনতা ব্যাংকের সকল শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি জনতা ব্যাংক শাখায় কর্মকর্তাদের সেবা প্রদানের মানও এখন আগের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত হয়েছে।

১৩. ক্ষুদ্রঋণ দলের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে দীর্ঘদিনের অনিয়মজনিত ভোগান্তির অবসান ও দরিদ্র নারী সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনা সৃষ্টি।

ব্র্যাক বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমতলের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক যখন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়িতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে তখন মনাটেক পাড়াতে দলগঠনের লক্ষ্যে মাঠকর্মীরা সভা করতে যান। তখন উক্ত কমীদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ব্র্যাক কর্মীর কাছে দলগঠনের প্রস্তাব করেন। সে অনুযায়ী মনাটেক পাড়ায়

বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয়। এরপর দলের সদস্যরা ব্র্যাক কর্মীদের পরামর্শমত সঞ্চয় জমাতে থাকেন এবং কেউ কেউ ঋণ প্রস্তাব করেন। পর্যায়ক্রমে সদস্যদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্রঋণ লাভ করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো পরিশোধ করতে থাকেন। এভাবে কার্যক্রম পরিচালনার একপর্যায়ে অর্থাৎ ২০০৭ সালে কোন এক কারণে গ্রামীণ ব্যাংক, আশা ও প্রশিকাসহ এলাকার অনেক ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মত ব্র্যাক তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এতে ক্ষুদ্রঋণ দলের সিংহভাগ সদস্য নিজেদের নেওয়া ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করলেও সঞ্চিত অর্থ লাভে বঞ্চিত হন। সদস্যরা ব্র্যাকের কাছে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ লাভের জন্য পরে বহুবার স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করলেও কখনো সদুত্তর পাননি। ব্র্যাক অফিস থেকে প্রতিবারই তাদের মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে যে, সঞ্চিত অর্থ কবে ফেরত দেওয়া হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। এভাবে দিনের পর মাস যায়, বছর যায়, অথচ কবে নাগাদ তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয় না। আবার কখনো কখনো তাদের বলা হয় যে, যারা ঋণ নিয়েছে তারা ফেরত দিলে অথবা সদস্যরা মিলে ঐ ঋণ পরিশোধ করে দিলে তবে তাদের অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। নতুবা কোন অর্থ ফেরত দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্র্যাক কর্মীদের এমন আচরণে হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যদের সবাই নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে এক প্রকার হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০১১ সালে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে রিইব কর্মীদের কাছে বিশেষভাবে জানার পর স্থানীয় সংগঠন "পাড়া- ট্রাস্ট" কর্মী প্রদীপ শশী চাকমা বিষয়টি কেন এভাবে চলতে থাকবে তা বিস্তারিত জানার জন্য তথ্য আবেদন করেন। তার তথ্য আবেদনের বিষয় ছিল:

১. ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি পেতে চাওয়া।
২. ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী- সঞ্চয় ও ঋণ পাশ বই ও বীমা খাত- ব্র্যাক এলাকা: মহালছড়ি, গ্রাম সংগঠনের নাম: মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বর ২১২৭, ক্ষুদ্র দল নং- ০২ এর আওতাভূক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি।
৩. কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাওয়া।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রদীপ শশী চাকমা উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য লাভের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (শুভাশীষ চাকমা, ম্যানেজার), ব্র্যাক, মহালছড়ি শাখা, খাগড়াছড়িতে গত ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে আবেদন করেন। এরপর আইন অনুযায়ী তথ্য লাভের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুদিন পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোনে যোগাযোগ করে কেন তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তা জেনে নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি উল্লেখিত বিষয়ে কোন তথ্য তাদের কাছে নেই বলে প্রদীপ শশী চাকমাকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেন। তিনি আরও

জানান, আবেদনের বিষয়ে কম্পিউটারের ফাইলে কোন তথ্য নেই, সব তথ্য হয়তো মুছে গেছে। যখন এ ঘটনা ঘটে, তখন তিনি এই অফিসের দায়িত্বে ছিলেন না, অন্যলোক দায়িত্বে ছিল। এখন সেই লোক অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। তাই তার পক্ষে এই তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান এবং সে কারণে তথ্য প্রদান করাও সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। তখন প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য না থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেন। অন্যথায় তিনি আপীল করবেন বলে তাকে জানিয়ে দেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি আইন অনুযায়ী ব্র্যাক এর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। তার প্রেক্ষিতে তাকে একটি উকিল নোটিশ পাঠানো হয়। সেই নোটিশ পড়ে তিনি তথ্য প্রদান না করার বিষয়টি অবগত হন। এতে প্রদীপ শশী চাকমা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই গত ২১ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন।

তথ্য কমিশন বিষয়টি আমলে নিয়ে গত ০৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে শুনানির দিন ধার্য্য করে উভয় পক্ষকে সমন জারি করে। কমিশনের কাছ থেকে সমন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য আবেদনের বিষয়টি নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটি বোঝাপাড়ার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার জন্য প্রদীপ শশী চাকমাকে অনুরোধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চান। তখন প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য প্রদান সাপেক্ষে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তথ্য কমিশনের শুনানিতে ব্র্যাক এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাতে কোনভাবেই নাজেহাল বা বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে না হয় তেমন বক্তব্য উপস্থাপনের আশ্বাস দেন। সে অনুযায়ী প্রদীপ শশী চাকমা তথ্য কমিশনে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এতে কমিশনের আদালত সন্তুষ্ট হয় এবং কোন জরিমানা না করে অভিযোগ নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেয়। উল্লেখ্য যে, সমঝোতার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্র্যাক মহালছড়ি শাখার ম্যানেজার হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যদের যাবতীয় সঞ্চয় ফেরত প্রদানের বিষয়ে মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ দলের ৫ জন সদস্যদের সঞ্চিত অর্থবাবদ সর্বমোট ১০৫৭৯ টাকা সঞ্চয় দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছে। অধিকন্তু, একই সংগঠনের আওতায় অপর আরো ২ টি সহ মোট ৩টি ক্ষুদ্র দল আছে যেগুলোর মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। এই সদস্যদের পাশ বইয়ের রেকর্ড অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেছে উক্ত সদস্যদের (১ টি সংগঠনের ৩টি ক্ষুদ্র দল) আনুমানিক সঞ্চয় প্রায় ৪৫০০০ টাকারও বেশি।

তথ্য কমিশনের শুনানিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির পরবর্তীতে উক্ত ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্যরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে ব্র্যাক মহালছড়ি অফিসে নিয়ম অনুযায়ী আবেদন জমা দেন। ম্যানেজার সদস্যদের আবেদন গ্রহণ করলেও সঞ্চয় প্রদানের ব্যাপারে আবারো আগের মত নানা টালবাহানা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে এক মাসের মধ্যে সমুদয় অর্থ প্রদান করবেন বলে জানান। এই বিষয়টি এলাকায় অনেকের মধ্যে জানাজানি হলে অন্যান্য দলের সদস্যরাও একইভাবে তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত

পাওয়ার ব্যাপারে ব্র্যাক অফিসে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। এতে কাজ না হলে তারা তথ্য আবেদন করবেন বলে জানান। এদের মধ্যে ইতিমধ্যে ২ জন সদস্য একইভাবে তথ্য আবেদন করেছেন। ভূক্তভোগীদের অনেকে মনে করছেন, প্রদীপ শশী চাকমা'র তথ্য আবেদনের ফলে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কামানো টাকা/সঞ্চিত অর্থ নিয়ে এনজিও সমূহ যে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি করে চলেছে তা চিরতরে অবসান হতে চলেছে এবং দরিদ্র নারীদের সঞ্চিত অর্থ লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু, সঞ্চিত অর্থ এভাবে আটকে রাখার কোন সিদ্ধান্ত নেই বলে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ তাদের লিখিতভাবে জানিয়েছে তাই তাদের আর সঞ্চয় আটকে রাখার কোন সুযোগ নেই। এর ব্যত্যয় ঘটলে সদস্যদের এখন আইনের আশ্রয় নেওয়ারও মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো মামলা পরিচালনার প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। এরপর হতে এলাকায় জনগণ তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় সরকারী ও এনজিও অফিসে তথ্য আবেদন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

১৪. কৃষকদের সারের বাড়তি দাম ফেরত পাওয়া

২৬/৮/২০১২ তারিখে নীলফামারী জেলার ভূমিবন্দর উপজেলার হাসিমপুর গ্রামে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির উদ্যোগে এক হাট সভা হয়। উক্ত সভায় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় হয়। এতে অন্যদের সাথে তথ্য অধিকার কর্মী কামরুন নাহার ইরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি কৃষকদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ধারণা দেন। তার কাছে কৃষকরা তথ্য অধিকার আইনের কথা শুনে ইউএনওর কাছে আবেদন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণটা হল- গত ২২/৮/২০২ তারিখে বাজারে বস্তা প্রতি সারের দাম ছিল ১০২৫ টাকা। আর রাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন পরের দিন তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ টাকা ধার্য্য করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। দেশে তথ্য অধিকার আইন হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে অনেকে এর কারণ জানার জন্য তথ্য আবেদন করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন। কৃষকদের মধ্যে সাহেদ আলী, নজির উদ্দিন, খালেক মিয়া ও সানাউল হক আবেদন করবেন বলে জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল ও সবুজ নামের দুই ইউনির্ভাসিটি ছাত্র তাদের তথ্য আবেদনপত্র লিখতে সহায়তা করেন যা পরের দিন ইউএনও অফিসে জমা দেন। আবেদনের পাওয়ার পরে ইউএনও আবেদনকারীদের ডেকে পাঠান। তারপরে যারা বেশি দামে সার কেনার রসিদ দেখাতে পেরেছেন তাদের বাড়তি টাকা সার বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে দেন।

১৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য প্রাপ্তি

মো: শামীন হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংর্ঘষ অধ্যয়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং রিইব-এর প্রশিক্ষিত তথ্যকর্মী। শান্তি ও সংর্ঘষ অধ্যয়ন বিভগের ছাত্র হওয়ার

সুবাদে তার একাডেমিক এসাইনমেন্ট এর অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমন বিষয়ে কিছু তথ্য প্রয়োজন পড়ে। তাই তিনি গত ১৯ মার্চ ২০১২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খোন্দকার, মহাপরিচালক (বহি:প্রচার অনুবিভাগ) এর নিকট "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে ডাকযোগে একটি তথ্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনে যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে : ১) গত ২০০৯-১১ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমনের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার তথ্য এবং ২) ২০০৯-১১ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কাজে কতবার বিদেশে ভ্রমন করেছেন তার সংখ্যা, তারিখ ও উদ্দেশ্য। আবেদনপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামীনকে ফোন দিয়ে জানতে চান যে, তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনকারী মো: শামীন হোসেন কি না এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কি না। উত্তরে শামীন ঐ কর্মকর্তাকে আবেদনকারী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন এবং তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তারপর আইন অনুযায়ী ২০ কার্যদিবস অপেক্ষা করে তথ্য না পেলে পরে অতিরিক্ত আরও ১০ কার্যদিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেলে গত ১৭ মে, ২০১২ তারিখে আপীল কর্মকর্তা মো: মিজারুল কায়েস, পররাষ্ট্র সচিব এর নিকট আপীল করেন। আইন অনুযায়ী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য দেওয়ার কথা থাকলেও উক্ত সময়ের মধ্যে কোন প্রকার তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে গত ১২ জুন, ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে বাধ্য হন শামীন। এমতাবস্থায়, গত ০৩ জুলাই ২০১২ তারিখে লিখিত আকারে আবেদনকৃত তথ্যের একটি কপি ডাকযোগে এসে পৌঁছায়। তথ্য পাওয়ার কিছু দিন পর (২৫ জুলাই ২০১২ তারিখে) তথ্য কমিশন থেকে ফোন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তিনি তথ্য পেয়েছেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়। তখন তিনি তথ্য পাওয়ার কথা তাকে জানিয়ে দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো শামীন সহপাঠীদের জানিয়েছেন। এই ঘটনা জানার পর তাদের অনেকে তথ্য আবেদন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপসংহার:

ওপরের প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশের প্রান্তিক কয়েকটি জনগোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। কিছু কিছু ব্যাপারে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিগৃহীত হলেও পরে তার ব্যত্যয় লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হয়েছে। এটা যে তাদের ক্ষমতায়নের পথে একটা বিরাট অগ্রগতি তা

নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে তাদের তথ্য চাহিদা এখনও প্রদানত সেবা খাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। সরকারী কাজে স্বচ্ছতা আনতে ও দুর্নীতি দূর করতে, জনগণের কাছে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে আরও যে যে ধরনের তথ্য চাওয়া প্রয়োজন সেদিকে তাদের অভিঘাত কম। এক্ষেত্রে মানসিক শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা এবং আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় জরুরী। আর এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের ভূমিকা পালন করা জরুরী। যা এই আইনটিকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভুমিকা পালনে সহায়তা করতে পারে।

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH

NETZ